Vol. 36 | No. 2 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# আধুনিক বাংলা উপন্যাসে পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতা



| | |
|---|---|
| Volume | 36 |
| Issue | 2 |
| Year | 1993 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | আকিমুন রহমান |
| Published online | February 1, 1993 |
| DOI | 10.62328/sp.v36i2.5 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.5 |
| Pages | 81-148 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতা

আকিমুন রহমান

বাঙালি জীবনে পল্লীই এখনো প্রকৃত অর্থে বাস্তবতা, যদিও নগরের বিকাশ ঘটেছে দুই শতাব্দী ধরে, তবুও নগরবাস্তবতাকে স্বাভাবিক বলে বাঙালি এখনো মেনে নিতে পারে নি। বাঙলা উপন্যাসে বাঙালির এই মনোভাব রূপায়িত হয়ে আছে। আধুনিক বাঙলা উপন্যাসগুলো যখন রচিত হচ্ছিলো তখন বাঙালি সমাজে গ্রাম ছিলো আরো আধিপত্যশালী এবং ঔপন্যাসিকেরা প্রায় সবাই গ্রামের সন্তান। পল্লীকেই তাঁরা প্রধানত বাস্তব বলে মনে করেছেন এবং অনেকে এ পল্লীকে স্বর্গের স্তরে উন্নীত করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় ধরা পড়ে যে ওই পল্লী স্বর্গের প্রতিভাসে এক ধরনের বাস্তব নরক। কেউ কেউ সমকালীন রাজনীতিক আলোড়ন-ক্ষুব্ধ জনপদ হিসেবে পল্লীকে উপস্থাপিত করলেও, অধিকাংশ উপন্যাসেই পল্লী এক অনড় অপরিবর্তনীয় ভূখণ্ডরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকেরা পৌনঃপুনিকভাবে দারিদ্র্যের বর্ণনা করেছেন, যে-দারিদ্র্য গ্রামের সবচেয়ে বড় সত্য। কিন্তু অনেকের কাছেই ওই দারিদ্র্য একটি গৃহীত শাশ্বত ব্যাপাররূপে গণ্য হয়েছে। পল্লী সম্পর্কে একটি প্রথাগত ধারণা রয়েছে যে পল্লী হচ্ছে সুক্ষ্ম শান্তির এলাকা, কিন্তু দু'একজন ঔপন্যাসিক প্রথাগত এ-ধারণা বাতিল করে দিয়ে দেখিয়েছেন পল্লীর নারকীয় রূপের চিত্র। পল্লীসমাজ ও জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা অবিকল উপস্থাপনা রীতিটি গ্রহণ করেছেন। তবে পল্লীসমাজ ও জীবনের বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি অভিন্ন ছিলো না। কেউ বাস্তবতার নিরাসক্ত উপস্থাপক, বাস্তবতাকে দেখেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে, ওই বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন করেছেন। আবার কেউ অনুপুঙ্খ উপস্থাপন করা সত্ত্বেও বাস্তবতাকে দেখেছেন রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে; ফলে বাস্তবতার নির্মমতা হ্রাস পেয়ে তা সুখকর হয়ে উঠেছে। আধুনিক বাঙলা ঔপন্যাসিকদের অনেকেই পল্লীসমাজ ও জীবনবাস্তবতার আখ্যান লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান তিনজন হচ্ছেন জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাসেও ধরা পড়েছে পল্লীসমাজ ও জীবনবাস্তবতার নানা রূপ। জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করকে গণ্য করা হয় শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরিরূপে। শরৎচন্দ্র প্রধানত পল্লীসমাজবাস্তবতার রূপকার। কুসংস্কার, কুপ্রথা, অমানবিকতা, সংকীর্ণতা ও ইতরামো পরিপূর্ণ পল্লীসমাজের নিরাবেগ উপস্থাপনা করেন তিনি। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়ও তাই। তবে শরৎচন্দ্রের মধ্যে আছে 'মনুষ্যত্ববোধে স্থির আস্থা'; অন্যদিকে জগদীশ গুপ্ত ওই মনুষ্যত্ববোধের ব্যাপারে 'সংশয়ান্বিত'। 'শরৎচন্দ্র মনে করেন নরনারীর বিড়ম্বনার প্রধান উৎস সমাজ ও দেশাচার',[১ক] আর জগদীশ গুপ্ত মনে করেন যে অপার শক্তিশালী পরিস্থিতিই নরনারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। জগদীশ গুপ্তের কাছে পল্লী গণ্য হয় নরক রূপে এবং পল্লীবাসীদের তিনি গণ্য করেন নরকবাসী রূপে। শরৎচন্দ্র যেমন শুধুমাত্র প্রথা ও বর্ণবাদশাসিত পল্লী সমাজবাস্তবতার চিত্রণে মনোযোগী ছিলেন, তারাশঙ্কর তেমনি শুধুমাত্র সমাজবাস্তবতার চিত্রণে মনোযোগী নন। ওই পল্লীজীবনে সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাত নির্দেশও তাঁর লক্ষ্য। তাঁর উপন্যাসে একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ পল্লীঅঞ্চলের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপিত হয়: তাঁর উপন্যাসে তাঁর সময়ের পল্লীকে পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসের পল্লীসমাজ কাল-নিরপেক্ষ নয়, বিশেষ কালের ঘটনা আলোড়ন দ্বারা আলোড়িত ওই সমাজ। বিভূতিভূষণ পল্লীসমাজ ও পল্লীজীবনকে দেখেন মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে। যে সমাজ ও দেশাচারকে নরনারীর জীবনের বিড়ম্বনার উৎসরূপে গণ্য করেন শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের কাছে তা মহিমাময়, সুন্দর, সনাতন, পবিত্র বলে বোধ হয়। ওই পল্লীসমাজ ও মানুষ নানা ত্রুটি সত্ত্বেও অতুলনীয়-বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এ-সত্যই প্রতীয়মান হয়। তিনি উপস্থাপন করেন পল্লীর দারিদ্র্যগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জীবনবাস্তবতা, কিন্তু ওই দারিদ্র্য পীড়াদায়ক নয়। তাঁর উপন্যাসের ওই পাত্রপাত্রীদের জীবনে ওই দারিদ্র্য ধর্মের মতোই জন্মসূত্রে পাওয়া এবং ব্যক্তির জীবনের ঐশ্বর্য বিশেষ। বিভূতিভূষণের পল্লীবাঙলাকে তাঁর সমকালের পল্লীবাঙলা বলেও মনে হয় না; মনে হয় তা মধ্যযুগের কোনো স্বনির্ভর, বিচ্ছিন্ন, আত্মমগ্ন, প্রথাশাসিত ও তুষ্ট পল্লীসমাজ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসসমূহে পল্লীকে উপস্থাপিত করেন ভূতলের স্বর্গখণ্ড রূপে। ওই জীবনে অসন্তোষ নেই, মানসিক সঙ্কট নেই। তিনি সাধারণত পল্লীর দরিদ্রশ্রেণী থেকে পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেন। তাঁর চরিত্রেরা গভীর সংবেদনশীল, খাপ না খাওয়া ও নিঃসঙ্গ। মানুষের

চাইতে তারা অধিক স্বস্তিবোধ করে প্রকৃতির সান্নিধ্যে, গ্রন্থপাঠে কিংবা বেহালা বাদনে। বাস্তবজগতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রবল অর্থনীতিক সঙ্কটে পীড়িত থাকে তাদের জীবন। কিন্তু ওই সঙ্কট ও দুর্দশা শ্বাসরুদ্ধকর বা পীড়াদায়ক নয়; ওই দারিদ্র্য নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ওই দারিদ্র্যকে মনে হয় চরিত্রদের জন্মসূত্রে পাওয়া ঐশ্বর্যবিশেষ। জীবনকে তা মহিমান্বিত করে তুলেছে। বিভূতিভূষণ পল্লী প্রকৃতির যেমন অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন তেমনি অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন দরিদ্র গৃহস্থ জীবনের, দেশাচার ও নানা আনুষ্ঠানিকতার। উপস্থাপন রীতিতে তিনি অবিকল, কিন্তু মনোভাবে রোম্যান্টিক। সুকুমার সেন বলেন: 'বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার ধ্বংসপথ বাহী পল্লী জীবনের অরণ্যাক্রান্ত পরিবেশে দারিদ্র্যজর্জর মুমূর্ষু নরনারীর ক্রমবর্ধমান অভিভব। হিংস্র আরণ্য লতাগুল্মের বেড়াজালে পড়িয়া মানবজীবন যেন শুকাইয়া আসিতেছে। বোধ হয় যেন জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো ভিটার নিঃসঙ্গ বিভীষিকা মরণের ছায়া ফেলিয়া শণৈঃ শণৈঃ অগ্রসর হইতেছে বাকি বসতিগুলি দখল করিতে। এই ধ্বংসপথযাত্রীর ছবি বিভূতিবাবুর রচনায় রোম্যান্টিক দূরত্বের প্রজেক্টরের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অভিজ্ঞতালব্ধ হলেও বাস্তব নয়, রোম্যান্টিক। সে দৃষ্টিতে প্রকৃতি মানব জীবনের খেলাঘর অথবা পটভূমিকা নয়; মানবজীবনই প্রকৃতির খেলাঘর অথবা পটভূমিকা।'[১খ] ওই দরিদ্র জীবনের সহজ শ্রী ও মাধুর্যের পরিচয় দানই তাঁর লক্ষ্য। এ-কারণে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার, আচার অভ্যাস খাদ্য ও রন্ধন, আতিথ্য সেবার উপকরণাদির অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন তিনি। বিভূতিভূষণের পুরুষ চরিত্রগুলি উদাসীন, নির্লিপ্ত, বাস্তবতার মুখোমুখি অসহায় ও ভালোমানুষ ধরনের চরিত্র। তাঁর নারী চরিত্রগুলি সংসার অভিজ্ঞ, শক্তিময়ী। পিতা স্বামী সন্তান সবাইকে রক্ষা করে জননীর মতো মমতায়। তারা পুরুষদের জন্য তৈরি করে দেয় নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, আত্মমগ্ন জীবনে স্বচ্ছন্দে বিচরণের পরিবেশ। প্রিয়জনদের যত্ন পরিচর্যায় যেমন তারা নিবেদিত, তেমনি নানাভাবে যোগাড়যন্ত্র করে দরিদ্র সংসারের চাকাকে সচল রাখায়ও সিদ্ধ তারা। বিভূতিভূষণের কাছে বাস্তবতারূপে গণ্য হয় পল্লীজীবন। তবে ওই পল্লীজীবনের কুশ্রীতা, কুৎসিত দেশাচার, শ্বাসরুদ্ধকর সংকীর্ণতা নির্দেশ তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ থাকে পল্লী প্রকৃতির দিকে। ওই প্রকৃতি বিচিত্ররূপিণী ও সুন্দর, আর প্রকৃতির কোল ঘেঁষে বাস করা মানুষদের জীবন প্রশান্ত, দারিদ্র্যগ্রস্ত তবুও মধুর। বিভূতিভূষণ হচ্ছেন দারিদ্র্যের রোম্যান্টিক উপস্থাপক। বিভূতিভূষণের এ-

শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ''পথের পাঁচালী'' (১৩৩৬), ''আরণ্যক'' (১৩৪৫) ''কেদাররাজা'' (১৯৪৫) ''আর্দশ হিন্দু হোটেল'' (১৩৪৭) ''দুইবাড়ী (১৩৪৮) ''বিপিনের সংসার'' (১৩৪৮) ''ইছামতি'' (১৩৪৮) ''অশনি সংকেত'' (পত্রিকায় প্রকাশকাল ১৯৪৪-৪৬)।

বিভূতিভূষণের প্রধান উপন্যাস ''পথের পাঁচালী'' (১৩৩৬)। এর তিনটি খণ্ড: ''বল্লালী বালাই'', 'আম-আঁটির ভেঁপু' ও 'অক্রূর সংবাদ'। এ-উপন্যাসে নিশ্চিন্দিপুর নিবাসী হরিহর রায় ও তার স্ত্রী সর্বজয়ার পারিবারিক জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তবে জীবন বাস্তবতার উপস্থাপনা লেখকের মূল লক্ষ্য নয়। তাঁর মূল উদ্দেশ্য 'একটি শিশুমন বিশ্বের আলোয় তার পাপড়িগুলি কিরূপে ধীরে ধীরে মেলছে, এর বিপুল রহস্যের প্রতি সচেতন হয়ে উঠচে' তা নির্দেশ।[২] উপন্যাসটিতে প্রাত্যহিক জীবন ও পল্লী প্রকৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে, বিভূতিভূষণ বলেছেন, ''খুব তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাগুলোকেও দিয়েচি এই জন্যে যে গোটা জীবনের স্মৃতির ভাণ্ডারে তাদের দান অমূল্য ও অক্ষয়'।[৩] এ-উপন্যাসে মুগ্ধ বিস্ময়ে একটি শিশু দেখেছে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে, বেড়ে উঠেছে শুদ্ধ, সুন্দর, তীক্ষ্ম, সংবেদনশীল ও খাপ-না-খাওয়া মানুষরূপে। তাঁর মুগ্ধতা-ভাবুকতা বিস্ময়ের বর্ণনা রয়েছে এ-উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে। কিশোর মনের স্বপ্নাচ্ছন্নতা, বিস্ময়মুগ্ধতা, দারিদ্র্য, নিশ্চিন্দিপুরের জন্য কাতরতা ছাড়াও এ-উপন্যাসে বাহ্যজীবন তথা পল্লীজীবনের বাস্তবতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ''বল্লালী বালাই' অংশে বর্ণিত হয়েছে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত হরিহর রায়ের সংসার বৃত্তান্ত। শিশুকন্যা দুর্গা ও স্ত্রী সর্বজয়াকে নিয়ে হরিহর রায়ের দরিদ্র সংসার। এ সংসারের এককোণে মাথাগুঁজে থাকে হরিহর রায়ের দূর সম্পর্কের কুলীন বিধবা বর্ষীয়ান দিদি ইন্দির ঠাকরুণ। এ-অংশে পাওয়া যায় দুর্গাকে। এ -অংশে চিত্রিত হয়েছে একটি পরিবারের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতার পরিচয়, অনটন-কলহ-আচার-সুখ-দুঃখ-কলহ-বিষাদময় পারিবারিক জীবন। ওই বাস্তব পীড়াদায়ক নয়, তা করুণ-কোমল-বিষণ্ন-মধুর এক উপকথার মতো। রূপকথায় যেমন দুঃসময়ে নেমে আসে অভাবিত করুণা, এ-উপন্যাসেও তেমনটি ঘটেছে। এখানে রূঢ় কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি চরিত্রগুলো যখন বিষণ্ন ও অসহায়, তখন হঠাৎ কল্যাণময়ী আনন্দময়ী পরীদের মতো কেউ না কেউ তাদের জন্য নিয়ে আসে সান্ত্বনা, শুশ্রূষা, আশা, প্রেরণা। যেমন সর্বজয়া কর্তৃক বিতাড়িত এবং সমাজের অন্যদের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে ইন্দির ঠাকরুণ যখন গ্রামের প্রান্তে একলা, ক্ষুধার্ত ও প্রচণ্ড জ্বর

আক্রান্ত, ওই কঠোর দুঃসময়ে হঠাৎ অভাবিতভাবে খাদ্য ও মমতা নিয়ে তার কাছে পৌঁছে যায় দুর্গা। মর্মস্পর্শী দারিদ্র্যসত্ত্বেও ওই জীবনে দেখা দেয় জন্মের উৎসব। একটি শিশু এসে তার নিজস্ব সৌন্দর্যে ভরে তোলে মলিন আঙ্গিনা। বিভূতিভূষণের বর্ণনায় দারিদ্র্য দুঃখকষ্ট গৌণ হয়ে গেছে, প্রধান হয়েছে জীবনের আনন্দ।

'আম-আঁটির ভেঁপু' অংশে প্রধান অপুর মুগ্ধতা, প্রকৃতির রহস্যে অভিভূত হওয়া, ভাবুকতা ও স্বপ্ন। প্রকৃতির বিচিত্ররূপ দেখে, নিসর্গের শোভায় তার মন বিভিন্ন অনুভূতি-উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়ে যায়, উদাস ব্যাকুল কল্পনাপ্রবণ হয়, উধাও হয়ে যায় নিরুদ্দেশে। এ-সবের পাশে দরিদ্র হরিহরের সংসার জীবনকথাও বিবৃত হয়েছে। কিন্তু ওই দারিদ্র্য মধুর হয়ে ওঠে, ভাইবোনের প্রীতিতে, প্রকৃতির শুশ্রূষায়। অপু স্বাপ্নিক, দুর্গা দরিদ্র সংসারের লুব্ধ, খাদ্য-বিলাসী, উড়নচণ্ডী কিশোরী। বাউণ্ডুলে হয়ে বনে-বাদাড়ে সারাদিন সে ঘুরে বেড়ায় কোনো না কোনো ফল পাকুড়, সবজি আনাজের সন্ধানে। লোলুপতা, উড়নচণ্ডীপনা সত্ত্বেও সেও কল্পনাপ্রিয় এবং আশাবাদী। পথের পরে সুদর্শন পোকা দেখে অসম্ভবের প্রার্থনায় নতজানু হয় তার কিশোরী হৃদয়। এ-অংশেও বাস্তবের কুশ্রীতা আবৃত হয়ে যায় মানবিক প্রীতিতে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। 'অক্রূর সংবাদ' অংশে আছে অপুদের নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে কাশীতে এসে সংসার পাতা ও পরবর্তী দুর্যোগের কাহিনী। হরিহর এবং সর্বজয়া দুজনেই আশাবাদী। স্বামী অর্থকড়ি উপার্জন করে স্বচ্ছলতা আনবে সংসারে, জীবনে সুখের আগমন ঘটবে এমন আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সর্বজয়া। কাশীর এক তেতলা বাড়ীর অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে একতলায় সংসার পাতে সর্বজয়া, স্বামী দশাশ্বমেধের ঘাটে বসে পুরাণ ব্রতকথা রচনা করে পাঠ করে। মোটামুটি স্বচ্ছলতা আসে সংসারে। হরিহর এতদিন গুটিয়ে রাখা তার রচিত পালাগুলো আবার বের করে। নতুন করে রচনা করে গাথা, পালা। সে স্বপ্ন দেখে পালা রচয়িতা হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে। অপু একটি স্কুলে ভর্তি হয়। গুছিয়ে ঘরকন্না পেতে যখন বসেছে সর্বজয়া, তখন একদিন ধরা পড়ে হরিহরের নিউমোনিয়া। যা কিছু সঞ্চয় ছিলো সব শেষ করেও সুচিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। হরিহরের মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় অনিশ্চিত সর্বজয়াকে রামকৃষ্ণ মিশন এক হিন্দুর বাড়ীতে রাঁধুনির কাজ জুটিয়ে দেয়। অপু ঠাঁই পায় মায়ের সঙ্গে। অনাদর, অসম্মান, অবহেলার মধ্য দিয়ে পার হতে থাকে তার কৈশোর। ওই রূঢ় অসুন্দর বাস্তবতার নিষ্পেষণে অপু যখন নির্জীব ও বিষাদিত, তখন তার জীবনে এসে পৌঁছে

রূপবতী দয়াবতী পরীদের মতো একজন, সুন্দর সহানুভূতিশীল লীলা এবং তার মা। তবু অপুর মন ওই নোংরা কুৎসিত ও অবমাননাকর বাস্তবতার আবেষ্টনে পীড়িত হয়ে পড়ে। অবাধ-নিস্তব্ধ-শ্যামলিমা পরিপূর্ণ নিশ্চিন্দিপুরের জন্য আর্তি হাহাকার জেগে ওঠে তার মনে। সে ফিরে যেতে চায় নিজের নির্জন গ্রামে। এ-অংশে রূঢ় কঠোর বাস্তবতার পরিচয় বিধৃত হলেও, বাস্তবতার উপস্থাপনা এখানে লেখকের লক্ষ্য নয়। ওই বাস্তবতা কোমল স্বপ্নগ্রস্ত সরল বালককে কতখানি কষ্ট দিচ্ছে, তার মন কি রকম সাড়া দিচ্ছে তা নির্দেশই তার লক্ষ্য। ওই কঠোর-কদর্য-অনুদার-অন্ধকারপূর্ণ বাস্তবতার পথ পেরিয়েই সে হয়ে উঠবে পূর্ণ মানব, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং গভীর সংবেদনশীল এক স্রষ্টা। এজন্য বাস্তবতার উপস্থাপনা এখানে। ওই বাস্তবতা অপুকে বিষণ্ন ও ক্লান্ত করে, সংকীর্ণতা ও নোংরামোতে তার প্রাণ হাফিয়ে ওঠে, সে ফিরে পেতে চায় অবাধ অবারিত নিশ্চিন্দিপুরকে। এ-রূঢ় জীবন হচ্ছে অপুর জন্যে বাস্তবতার প্রথম পাঠ। ''পথের পাঁচালী''তে সমাজ-সংসার জীবনের বাস্তবতাকে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় অপু ও দুর্গার প্রতিবেশের গভীর অন্তরঙ্গ বিবরণ। ওই প্রতিবেশ শ্যামল বনবনানী শোভিত, নির্জন, নিস্তব্ধ এবং রহস্যময়। এর সৌন্দর্য মনকে বিস্ময়মুগ্ধ করে, অজানা অনির্দেশ্য কিছু একটা পাবার জন্য ব্যাকুল করে তোলে, ভাবনা জাগায়, স্বপ্ন দেখায়। এই প্রতিবেশ অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে বিশেষ অঞ্চলের রঙ ফুটিয়ে তোলার জন্য নয়; অপুকে মুগ্ধ, বিস্মিত, বিহ্বল ও স্বাপ্নিক করে তোলার উদ্দীপকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতিবেশ।

•

''আরণ্যক''-এ (১৩৪৫) চিত্রিত হয়েছে অরণ্যবাসী অতি দরিদ্রের জীবনের বাস্তবতা। একে ঠিক পল্লী বলা যায় না, তা পল্লীরই দূর আত্মীয়। পূর্ণিয়া জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গল মহালের প্রেক্ষাপটে ''আরণ্যক'' রচিত। ঋতুতে ঋতুতে আরণ্য প্রকৃতি ও প্রতিবেশের রূপবদল এবং অধিবাসীদের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে ''আরণ্যকে''। এ-উপন্যাসে পুঁজিবাদের আগ্রাসনে অরণ্য ধ্বংস হয়েছে এবং মানুষের জীবনে বিস্তার করেছে আধিপত্য। এ-উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ, সে অপুর মতোই স্বাপ্নিক। ওই অরণ্যের নিস্তব্ধতা ও নির্জনতা, প্রহরে প্রহরে, ঋতুতে ঋতুতে রূপ বদলের মোহনীয় মায়া সত্যচরণকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। প্রকৃতি যেমন গম্ভীর, ঔদার্যপূর্ণ, বিশাল, মানুষের জীবন তেমনি অপরিমেয় সংগ্রাম-দারিদ্র্য-ক্ষুধা-অনটন নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নভাবে টিকে থাকার সংগ্রাম চালাতে হয় অরণ্যবাসীদের, শীতে লড়ে যেতে হয় দুর্দমনীয় শৈত্যের সঙ্গে,

গ্রীষ্মে ভয়াবহ উত্তাপ ও জলকষ্টের সঙ্গে। এছাড়া সম্বৎসর ধারাবাহিক ভাবে লড়তে হয় অন্নাভাবের সঙ্গে। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী এই মানুষগুলোর খাদ্য হচ্ছে চিনার দানা সেদ্ধ, শাক পাতা সেদ্ধ, ছাতুমাখা ইত্যাদি। অনাড়ম্বর, সরল, সহজ তাদের জীবন ধারা। খাদ্যাভাবগ্রস্ত এই মানুষগুলো সামান্য ভাত খেতে পাবে এই আশায় সাত আট মাইল দূরের কাছারিতে চলে আসে শীতরাত্রির হিম উপেক্ষা করে। কিছু খেতে পাওয়াটাই তাদের কাছে বড় পাওয়া। তাই সামান্য খাদ্য চীনার-দানা ও একটু নুন জল খাবার হিসেবে পেয়ে অনিন্দ্যতৃপ্তিতে ভরে যায় তাদের মন। অসহনীয় কায়ক্লেশ ও কঠোর সংগ্রামপূর্ণ তাদের নিত্যকার জীবন, তবে দারিদ্র্য ও কঠোর জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ নেই, কোনো কিছু কিংবা কারো বিরুদ্ধেই তাদের কোন অভিযোগ নেই। ক্ষুধা, অনটন, জীবিকা নির্বাহের কঠোর শ্রম, ক্ষুন্নিবৃত্তির সামান্য অন্ন সবকিছুই সহজভাবে মেনে নিয়েছে তারা। ওই আরণ্য পল্লীতে যেমন ধূর্ত মহাজন আছে, তেমনি আছে ধাওতাল সাহুর মত নিরাসক্ত বিত্তে নিস্পৃহ সাদাসিদে মহাজন। দারিদ্র্য অনটন সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ভাবুক, স্বাপ্নিক, খাপ না খাওয়া, নিস্পৃহ, ওই প্রকৃতির মতোই। জীবনের সমস্ত গতির আনন্দ অর্থহীন ওই জীবনে। শোভাময় বনভূমির জমি প্রজাবিলি করার ফলে ওই অরণ্য পরিণত হয় ঘিঞ্জি বস্তিতে। কুৎসিত অসুন্দর ঘরদোর, উলঙ্গ কৃষ্ণকায় শিশুর দল পথের পরে ধুলাবালি ছড়িয়ে খেলায় মত্ত থাকে, দরিদ্র অসুন্দর জীবনের ছবি মুদ্রিত হয়ে থাকে তার সর্বত্র। অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন করে ওই জমিতে বসতি স্থাপন করার ব্যাপারটি দুরকম প্রতিক্রিয়া জাগায় সত্যচরণের মনে। অরণ্যের জন্য ব্যাকুল ও বিষণ্ন হয় সে এককে সময়, আবার শস্যপূর্ণ জনপদ প্রতিষ্ঠার সাফল্য ও সুখে হৃদয় ভরে ওঠে। এ-উপন্যাসে অরণ্যই বাস্তব, মানুষগুলো যেনো ওই মহান সুন্দর বাস্তবতার মধ্যে তুচ্ছ অসুন্দর। এখানে মানুষ ও প্রকৃতি মিলিত হয়নি; প্রকৃতির মধ্যে থেকেও মানুষ থাকে আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন, সৌন্দর্যের মধ্যে অসৌন্দর্যের মতো।

বিভূতিভূষণ ''কেদাররাজা'' (১৯৪৫) উপন্যাসেও ব্যর্থ ও দরিদ্র পল্লীজীবন বাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে। তবে ওই জীবনকে বিভূতিভূষণের কাছে সুধাময়, শ্রীমণ্ডিত ও মাধুর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, তাঁর লক্ষ্য ওই শ্রী ও সুধা ও মাধুর্যের পরিচয় দান। এ-কারণেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন গৃহকর্ম, আচার অভ্যাস খাদ্য আতিথ্য ইত্যাদির বর্ণনা অনুপুঙ্খ দিয়েছেন, দিয়েছেন অনটন জীর্ণতার পরিচয়, কিন্তু অন্নপূর্ণার মতো শত অনটনেও

প্রতিদিন নানা অন্নব্যঞ্জন পুত্র-পরিজনের সামনে পরিবেশন করে দরিদ্র গৃহের গৃহিণী। তেজী, ব্যক্তিত্বময়ী, সেবাপরায়ণা, পরহিতব্রতী, প্রিয়জনের যত্নপরিচর্চায় সম্পূর্ণ নিবেদিতা, যোগাড়যন্ত্র করে গতিরুদ্ধ দরিদ্রসংসারের চাকাকে সচল রাখায় সিদ্ধ বিভূতিভূষণের নারীচরিত্রের। এই শক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাশীল ও নিশ্চিন্ত বলে নির্লিপ্ত পুরুষ বা গৃহকর্তা দারিদ্র্যের পীড়নে খুব বেশি হিমশিম খায় না। কিভাবে সংসার চলবে সে ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। ''কেদাররাজা'' উপন্যাসে ব্যর্থ দরিদ্র ভালোমানুষ আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন ও সৎ কেদাররাজার জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে। কেদাররাজার পূর্বপুরুষ ছিলো রাজা, কেদাররাজা তাদের দরিদ্র উত্তরপুরুষ। প্রৌঢ় এই উত্তরপুরুষটি সকাল সন্ধ্যা দুপুর সর্বদাই মাছ ধরা, বেহালা বাজানো কিংবা যাত্রার পালা মুখস্থ করার কাছে ব্যস্ত থাকে। দু এক ঘর প্রজা যা আছে তাদের থেকে অল্প খাজনা যা আদায় হয় তাতে কায়ক্লেশে দিন কাটে। এ-উপন্যাসে বহুঘটনা; কেদাররাজার কন্যা শরৎকুমারীকে লম্পটের কবলে পড়ে পতিতালয়ে পর্যন্ত যেতে হয়, কিন্তু সহৃদয় এক ভ্রাতার সহায়তার অক্ষুণ্ণ থাকে তার সতীত্ব। এ-উপন্যাসের দারিদ্র্যও নির্মম কিন্তু মধুর। উপন্যাসে নগরও রয়েছে; কিন্তু নগরের বর্ণনায় তিনি ব্যর্থ। যেমন পতিতালয়ের প্রতিবেশ যথার্থরূপে উপস্থাপিত হয়নি, থেকে গেছে অস্পষ্ট। তার পতিতাও অতি হৃদয়বান, সৎ, উপকারী ভালো-মানুষ। বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের মতো ''কেদাররাজা'য়ও সাধারণ দরিদ্র গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখপূর্ণ বাস্তবতার চিত্রণ ঘটেছে। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত দারিদ্র্য জর্জর সংসারে অতিকষ্টে সংগৃহীত এবং অতি যত্নে রান্না করা 'ডাঁটা-চচ্চড়ি', 'ডুমুর' কি 'থোড় ছেঁচকি,' 'স্বল্প তেলে পোড়া পোড়া করে ভাজা পাকা কাঁচকলা' এই সব আপাত সামান্য খাদ্য সামগ্রীর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, তুলে এনেছেন দারিদ্র্যজর্জর জীবন বাস্তবতাকে।

''আদর্শ হিন্দু হোটেল'' (১৯৪০) একান্তভাবে পল্লীর উপন্যাস নয়, কিন্তু পল্লীর সাথে রয়েছে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাণাঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন বাজারের পটভূমিকায় ''আদর্শ হিন্দু হোটেল''-এর কাহিনী রচিত। হাজারি ঠাকুর রাঁধুনি বামুন; সে সৎ, নির্বিরোধী ভালোমানুষ, সে তার কাজের প্রতি বিশ্বস্ত। তার সরলতা ও সততার সুযোগে তাকে ঠকায় মনিব বেচু চক্রবর্তী, হেনস্থা করে হোটেলের পদ্মঝি। অন্য হোটেল থেকে অনেক বেশি মাইনের চাকুরির প্রস্তাব এলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তার দুঃসময়ে বেচু চক্রবর্তীই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো। সর্বদাই তাকে অন্যায়

অপমান সইতে হয়, দোষী বলে চিহ্নিত হতে হয়। আত্ম অপমান জুড়াতে একাকী বসে থাকতে হয় চূর্ণী নদীর ধারে। বিভূতিভূষণ তার অন্যান্য চরিত্রদের ভাবুকতা, স্বপ্নগ্রস্ততা থেকে হাজারিকেও বঞ্চিত করেননি। হাজারি ঠাকুরের মধ্য দিয়ে তিনি এ-উপন্যাসটিতে একটি আইডিয়ার প্রতিষ্ঠা বা জয় ঘোষণা করতে চেয়েছেন। সরল নিরীহ হাজারি ঠাকুর সংসারের সকল বিরূপতা সত্ত্বেও নিজের যোগ্যতা ও সততার গুণেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রতিকূল বাস্তবতার শত বিরূপতা-নির্মমতা সত্ত্বেও সততার জয় অনিবার্য এ-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভূতিভূষণ এ-উপন্যাসে। তবে সাধারণ গৃহস্থজীবনের দুঃখসুখের পরিচয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে ওই জীবনের শ্রী ও মাধুর্যের পরিচয় দিতে তিনি ভোলেননি। সাধারণ জীবনের বাস্তবতার অনুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তার বৈশিষ্ট্য। বেচু চক্রবর্তীর হোটেলের প্রাত্যহিক বাস্তবতার বিশদ বিবরণ যেমন পাই, তেমনি পাই হাজারি ঠাকুরের সরলা ভালোমানুষ স্ত্রীর গার্হস্থ্য জীবনের বিবরণ। এ-উপন্যাসটিও সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনবাস্তবতা, স্বপ্নসাধ বাসনার আলোড়নকে ধারণ করে আছে। ওই জীবন দারিদ্র্যগ্রস্ত, লাঞ্ছনা অপমান বিদীর্ণ, তবুও স্বপ্ন দেখে সুন্দর ভবিষ্যতের, পরিকল্পনা করে লাঞ্ছনার জীবনকে পেছনে ফেলে সফল হোটেল মালিক হয়ে ওঠার। আর সে স্বপ্ন পরিকল্পনা অচিরেই বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায় অর্থকড়ির অভাবে। তবুও স্বপ্নপরিকল্পনা নিয়ে কথা বলার সুখটুকু উপরি পাওনা হিসেবে পায় হাজারি। এটুকু তার বর্তমানের স্বস্তি, ভবিষ্যতের জন্য প্রেরণা। হোটেল জীবনের বাস্তবতাও লিপিবদ্ধ হয়েছে উপন্যাসে। হাজারির আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিলাষ ও সংগ্রামের পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন লেখক হাজারি ঠাকুরের সফল ও সচ্ছল জীবনের পরিচয় নির্দেশে। হাজারির ইচ্ছা ও স্বপ্নপূরণের গল্প হয়ে উঠেছে এটি। হোটেল জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অনুপুঙ্খ ও বিশদ কিন্তু নিরপেক্ষ ও কঠোর বাস্তব বর্ণনা মাত্র তা নয়। ওই রূঢ়তা অপমান তাচ্ছিল্য কঠোরতার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে কর্মনিষ্ঠার গৌরব দেখানোর জন্যে।

''দুইবাড়ী'' (১৩৪৮) রচিত গ্রাম ও মহকুমা শহরের প্রেক্ষাপটে। রামতারণ চৌধুরী গ্রামের দরিদ্র গৃহস্থ, ঋণ করে কায়ক্লেশে সংসার-জীবন নির্বাহ করে থাকে। বিভূতিভূষণ তার পরিবারের দারিদ্র্যের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন বিভিন্ন ঘটনায়। রামতারণের পুত্র মফস্বল শহরে মোক্তারি করে সামান্য টাকা কড়ি আয় করে সংসারের অনটন মেটাবার প্রয়াস চালায়।

শনিবার শনিবার সে পাঁচ মাইল দূরবর্তী মহকুমা শহর থেকে গ্রামের বাড়ীতে হেঁটে চলে আসে ছুটির দিন কাটাবার জন্য। নিধুর মা তার জন্য যত্ন করে কচুর শাক রাধে, প্রিয় খাদ্যগুলো সামনে সাজিয়ে দেয়। মোক্তারীতে নিধুর আয় সামান্যই, তবে ওই জীবনেও আছে প্রতিষ্ঠিত মোক্তারদের রেশারেশি, কন্যাদায়গ্রস্ত বয়স্ক মোক্তার তৎপর হয় তরুণ অবিবাহিত মোক্তারের কাছে কন্যা গছিয়ে দায়মুক্ত হতে। এক শনিবারে গ্রামে গিয়ে নিধু দেখে তাদের পাশের পরিত্যক্ত বাড়ীর জজ লালবিহারী বাবু পুজো করার জন্য দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফিরেছেন। জজ সাহেব ধনী এবং পদস্থ হলেও ভালোমানুষ, নিরহংকারী, ও নম্র। তার স্ত্রী কন্যা পুত্ররাও সরল, আন্তরিক, মানুষকে ভালোবেসে নিকট করে নেয়া। কন্যা মঞ্জুর সঙ্গে গড়ে উঠে নিধুর আন্তরিক সম্পর্ক। সংসারের অভাব, মক্কেল পাবার অনিশ্চয়তা, কায়ক্লেশে জীবন যাপন করা ইত্যাদি সবকিছুই তখন গৌণ হয়ে যায় নিধুর কাছে। মন উন্মুখ হয়ে থাকে শনিবারের জন্য, শনিবার বিকেলে বাড়ি পৌঁছে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করার জন্য। মঞ্জু দয়াবতী সরলা তরুণী। নিধুদার জন্য নানারকম জলখাবার তৈরি করে খাওয়ায় তাকে, প্রায় প্রতিবেলা আহারের নিমন্ত্রণ করে। গল্প-হাসি-রসিকতা-কুশলবাক্য-প্রতিকাজে নিধুদার সহায়তা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মধুর প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। নিধুর মন অনুরক্ত হয় মঞ্জুর প্রতি, যদিও অনুরাগ সে গোপন রাখে। মঞ্জুর জন্য মহকুমা অফিসারের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব আসে। এক শনিবার বিকেলে নিধু হেঁটে বাড়ি ফিরছিলো, পথে তার তীব্র জ্বর আসে। ধুকতে ধুকতে বাড়ি পৌঁছে অজ্ঞান হয়ে যায় সে। শহর থেকে নামী চিকিৎসক আনার ব্যবস্থা করার জন্য মঞ্জু তার বাবাকে বলে। ধরা পড়ে টাইফয়েড হয়েছে। দীর্ঘ দুমাস অচেতন-অর্ধচেতন থাকার পর নিধু রোগমুক্ত হয়। সজ্ঞান হবার পর জানতে পারে পিতার ছুটি ফুরিয়ে যাবার কারণে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে মঞ্জুকেও গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। অসুখের সময় প্রতিদিন প্রায় সারাক্ষণ মঞ্জু নিধুর শয্যাপার্শ্বে বসে থেকেছে, যাবার সময় চোখের জল বাধা মানেনি তার। রোগমুক্তির পর দুর্বল নিধু ডাক্তারের নির্দেশ মত সকাল বিকাল হেঁটে বেড়ায় আর পরিত্যক্ত নিঃশব্দ অন্ধকার বাড়ীটার দিকে আনমনা চেয়ে থাকে। এ-উপন্যাসে পল্লীর একটি দরিদ্র পরিবার ও গ্রামে বেড়াতে আসা ধনী পরিবারের জীবন বাস্তবতা অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়। কিন্তু এ-উপন্যাসেও বাস্তবতার উপস্থাপনা লেখকের লক্ষ্য নয়,

একটি ব্যর্থপ্রেমের গল্প বলাই তাঁর লক্ষ্য। বিভূতিভূষণের যে দারিদ্র্যের জগত তা এ-উপন্যাসেও উপস্থিত।

''বিপিনের সংসার''ও (১৯৪১) দরিদ্র জীবন বাস্তবতার বিভূতিভূষণ-ধর্মী উপস্থাপনা। একদা ধনশালী নায়েবের পুত্র বিপিন বিপুল ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে, কিন্তু অজস্র অপচয়ের মধ্য দিয়ে নিঃস্ব হতেও তার দেরি হয় না। অভাব অনটন, স্ত্রীর নিত্য খোঁটায় অতিষ্ঠ হয়ে সেকাজ নেয় পিতার মনিব জমিদার অনাদি চৌধুরীর সেরেস্তায়। জমির দলিলপত্র দেখাশোনা, খাজনা আদায় ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব থাকে তার ওপর। সংসারের নিত্য অনটন, ছোট ভাইটির নেফ্রাইটিস রোগ, স্ত্রীর অভিযোগ, ঠিকমতো খাজনাপত্র আদায়ে ব্যর্থতার জন্যে মনিব ও মনিব-গিন্নীর ভৎর্সনায় তার চিত্ত থাকে বিক্ষিপ্ত। এর মধ্যে সান্ত্বনা হিসেবে পায় জমিদার কন্যা সুলতার আন্তরিক সৌহার্দ্য সহানুভূতি, যত্ন ভালোবাসা, তার দারিদ্র্যপূর্ণ নিরানন্দ জীবনে সুলতা বা মালীর ভালোবাসা অভাবিত মাধুর্যের স্বাদ দেয়। স্ত্রীর আবেগশূন্যতা, শুধু সাংসারিক প্রয়োজন নিয়ে কথা বলার প্রবণতা তাঁকে বিষণ্ন ও বিরক্ত করে। সেও কেনো সুলতার মতো ভালোবাসা যত্ন মমতা দিতে পারে না এজন্য বিপিনের মনে গোপন ক্ষোভ ও দুঃখ জন্মে। বিপিন অপরিণামদর্শী উচ্ছৃঙ্খল ঠিকই, তবে অন্তর্লোকে সে বিষণ্ন, স্বপ্নকাতর, রোম্যান্টিক। দারিদ্র্য তারই অক্ষমতার ফল, কিন্তু স্ত্রীর মুখে অভাব অভিযোগের অত ফিরিস্তি তাকে বিরক্ত করে। স্ত্রীর কাছে সে আশা করে সহমর্মিতা, অনুকম্পা, মানসিক সমঝোতা। অন্তর্লোকে সে ভাবুক, স্বাপ্নিক, প্রেমিক এবং কোমল। তার মন প্রকৃতির সৌন্দর্যে উদাস হয়, প্রাচীন বয়োবৃদ্ধের প্রতি আগ্রহবোধ করে। বিপিন খাপ-না-খাওয়া মানুষ। পিতার নায়েবী পেশা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেও, পিতার মতো দরিদ্র প্রজাসাধারণকে নির্যাতন করে খাজনা আদায় করার কথা ধারণায়ও আনতে পারে না। বরং অবাক হয় এই ভেবে যে তার পিতা কি করে এদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। তার জীবনে বিবাহিতা নারীরা বারবার অযাচিত ভালোবাসা ও মমতা নিয়ে আসে, সে তাতে মুগ্ধ হয়, কিন্তু অশান্তির ভয়ে সে তা গ্রহণ করতে পারে না। বিভূতিভূষণ দরিদ্র পল্লী-গৃহস্থের জীবনবাস্তবতার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের খাদ্যের প্রতি গভীর ও অদম্য লালসা; তাদের আচারআচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি বিশ্বস্তভাবে অঙ্কিত হয়েছে এ-উপন্যাসেও। যে জীবনবাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায় তা দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, কিন্তু ক্ষুদ্র আত্মত্যাগ, অশ্রুদীর্ঘশ্বাস, সামান্য প্রাপ্তি ও তৃপ্তির স্পর্শে প্রশান্ত। বিভূতিভূষণের রোম্যান্টিক মনোভঙ্গির জন্যে নির্মম

বাস্তবতাও নির্মম থাকে না; উপন্যাসটিকে মনে হয় নিসর্গআচ্ছাদিত দরিদ্রজীবনের উপকথা।

''ইছামতী'' (১৩৫৬) রচনার পেছনে বিভূতিভূষণের যে-আবেগ কাজ করেছে, তা তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে: 'কত হাসি-কান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এলো, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল-কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ঐ ঠাণ্ডাজলের কিনারাতেই, কত তরুণী সময়ের পাষাণ•বর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।''[৪] বিভূতিভূষণের লক্ষ্য জীবনলীলা বর্ণনা; তাই বাস্তবজীবন তার সমস্ত নির্মমতা সত্ত্বেও হয়ে উঠেছে মধুর আনন্দময়। ১২৭০ বঙ্গাব্দের বাঙলা দেশের একটি গ্রাম এই কাহিনীর পটভূমি। যশোর জেলার ইছামতী নদী তীরবর্তী মোল্লাহাটি গ্রামের জীবনযাত্রা ও পল্লীপ্রকৃতি উপস্থাপিত হয়েছে ''ইছামতী''তে। উপন্যাসের একদিকে আছে নীলকুঠির ইংরেজ কর্মকর্তাদের জীবনযাত্রার কাহিনী, অন্যদিকে রয়েছে ওই গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন বৃত্তান্ত। প্রবহমান ইছামতীর কূলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ গৃহস্থেরা যে জীবন যাপন করে চলেছে তার ইতিকথা বর্ণিত এখানে। ''ইছামতী'' উপন্যাসে উপস্থাপিত বাস্তবতা রোম্যান্টিক আবেগের রঙে রঞ্জিত। বিভূতিভূষণ এ-উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, দুঃখ অনটন, সামাজিক অন্যায়, রক্ষিতা নারীর জীবন, যৌতুক, কুলীনকন্যার বিবাহ সমস্যা, বহুবিবাহ, শাশুড়ী-বধূর কলহ-নির্যাতন, চোর-দুষ্কৃতকারীর জীবন সবই চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু ওই বাস্তবতাকে পীড়াদায়ক মনে হয় না, বরং মনে হয় দূরবর্তী কোমল, সুন্দর এক উপকথা। লেখক দেখেছেন তাকে মুগ্ধ বেদনাপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিতে। কালস্রোতে জীবনের যে ক্ষণস্থায়ী বুদবুদ জাগছে তার বৈচিত্র্য নির্দেশ করেছেন তিনি। ওই ধারাবাহিক লীলার পুনরাবৃত্তি নিয়ে মহাকালের স্রোত অজানার দিকে ছুটে যাচ্ছে-এই পরিণাম তাকে বেদনাবিধুর বা বিষণ্ন করে তুলেছে। বিভূতিভূষণের কাছে বাস্তবতার রূঢ়তা, প্রবঞ্চনা, দুঃখ-অনটন-ক্লেদ-কলুষ সবই হচ্ছে জীবনের বিচিত্ররূপ; আর তারই ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি হচ্ছে জীবন। মানুষ হচ্ছে কালের বুদবুদ। দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্তি ও বেদনাময় দৃষ্টিতে তিনি বাস্তবতাকে দেখেছেন। তাই ওই বাস্তবের রূঢ়তাও হয়ে উঠেছে মধুর। বিংশ শতকের মধ্য পর্যায়ে বসে প্রায় একশ বছর পূর্ববর্তী সমাজজীবন বাস্তবতাকে উপস্থাপন করার মধ্যেও ধরা পড়ে বিভূতিভূষণের রোম্যান্টিক মনোভঙ্গি। দুঃখ-সুখ-রূঢ়তা-ক্লেদ-অনটন-

অপ্রাপ্তি ভরা নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবন বাস্তবতা অনুপুঙ্খ চিত্রিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা নিরপেক্ষ চিত্রণ নয়; লেখক এর প্রতি অনুরক্ত। তাই ওই বাস্তবতাকে মধুর, দূরবর্তী সুন্দর বলে মনে হয়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দুঃখ যেন জীবনকে মহৎ করে তোলে, এখানে রূঢ়তাও সুন্দর, সুখও সুন্দর, কলহ বিবাদ সুন্দর; অনটন অপ্রাপ্তিও জীবনের মহৎ সৌন্দর্যেরই একটি দিক। এখানে বাস্তবতা হয়ে উঠেছে উপকথার মতো সুখকর। ক্ষুদ্র দুঃখ-ব্যথা-বঞ্চনা, শোষণ-মৃত্যু-বিরহ-মিলন পূর্ণ জীবনের গাথা হচ্ছে ''ইছামতী''।

''অশনি-সংকেত'' উপন্যাসটির রচনাকাল মাঝ ১৩৫০ থেকে মাঝ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। ধারাবাহিকভাবে এটি ''মাসিক মাতৃভূমি'' পত্রিকায় জানুয়ারী ১৯৪৪ থেকে জানুয়ারি ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ''মাতৃভূমি'' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভূতিভূষণ উপন্যাসটি সমাপ্ত করেননি। অসমাপ্ত অবস্থায় এটি দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর ওই অসমাপ্ত আকারেই এটি ১৯৫৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাই এটির গ্রন্থকারে প্রকাশ পরে ঘটলেও এটি আমাদের আলোচ্য পর্বেরই উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত পল্লীজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। কাহিনীর শুরুতে রয়েছে সচ্ছল নিস্তরঙ্গ সাধারণ পল্লী জীবনের কাহিনী। গ্রামের সাধারণ মানুষ পরস্পর মিলেমিশে থাকে, দেবদ্বিজে ভক্তি জানায়, প্রণামি দেয়। অতি সচ্ছল না হলেও সাধারণ চাহিদাগুলো মিটিয়ে স্বস্তি ও তৃপ্তিতে দিন যাপন করে তারা। বিশ্বযুদ্ধের থাবা এসে হরণ করে ওই স্বস্তি ও প্রাত্যহিক খাদ্য জোটাবার সামর্থ্য। চাল অগ্নিমূল্য, দুর্লভ হয়ে ওঠে; মন্বন্তরের দংশনে দিশেহারা মানুষ কলমিশাক, লতাপাতা, কলাই সেদ্ধ, কচু সেদ্ধ, ঝিনুক-গুগলি সেদ্ধ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে চলে। অনাহারে অনেকে মৃত্যুবরণ করে, সাধ্বীগৃহস্থ বউ দেহ বিক্রী করে চাল সংগ্রহ করে, দোকান থেকে ধান চাল লুট হতে থাকে। অবশেষে অসহায় হতাশ ক্ষুধার্ত মানুষ দলে দলে ছোটে শহরের দিকে। গৃহস্থবধূরা পতিতা-দালালদের হাত ধরে শহরের দিকে পা বাড়ায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরগ্রস্ত পল্লী বাঙলার এই জীবনবাস্তবতার পরিচয় তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ ''অশনি সংকেত'' উপন্যাসে। শান্ত সহজ শ্রী ও মাধুর্য সম্পন্ন পল্লীজীবন মন্বন্তরের দংশনে কেমন জর্জরিত হয়েছে তার বিবরণ রচনা করছেন বিভূতিভূষণ। ওই মন্বন্তর হরণ করছে সাধারণ গৃহস্থের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিকতা, অন্নাভাব সবাইকে উদভ্রান্ত করে তাড়িয়ে ফিরছে, একটু ফেনের জন্য ব্যাকুল হয়ে আহাজারি করছে মানুষ, গৃহত্যাগ করে পা বাড়াচ্ছে কঠিন

কঠোর অচেনা নগরের দিকে। বিধ্বস্ত হচ্ছে গৃহকোণের শান্ত সুখ ও নিরাপত্তা। বিভূতিভূষণ করুণা বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে ওই মন্বন্তরগ্রস্ত বিপন্নজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তবে এ–উপন্যাসে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর ও বিশ্বযুদ্ধের দংশনগ্রস্ত সময় ও পল্লীজীবন নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। বিপন্ন ক্ষুধাকাতর নিরন্ন মানুষের খাদ্য অন্বেষণ, তাদের উদভ্রান্তি ও অসহায়তার দিকে বেদনাকাতর ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন লেখক। তিনি দেখান যে এতো ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা, উচ্চ দ্রব্যমূল্য, মুদ্রাস্ফীতি ওই জীবনকে বিপন্ন করে তুললেও পল্লী মানুষগুলো মানবিকতা হারায়নি; আত্মত্যাগ করার কোমলবৃত্তি তাদের নষ্ট হয়নি। নিজে উপবাস করে আশ্রয় প্রার্থী ব্রাহ্মণের পাতে খাদ্য তুলে দেয় অনঙ্গবৌ, দিনের পর দিন উপবাসে থাকে সেও, তবুও ক্ষুধার কষ্ট সয়ে অন্যকে খাদ্যের ভাগ দেয়। প্রতিবেশী ছোট বৌ দেহ বিক্রী করে যে চাল পায় তা এনে ভাগ করে নেয় অনঙ্গ বৌয়ের সঙ্গে। বিভূতিভূষণের পল্লীর মানুষগুলো কোমল, মানবিকগুণ সম্পন্ন, দয়াদ্রচিত্ত। প্রাচীন ভারতীয় মহৎমূল্যবোধ সম্পন্ন গৃহস্থ তারা সবাই। একই মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ''চিন্তামণি''। ওই উপন্যাসে মন্বন্তরের চাপ ও মানুষের দুর্বিষহ কষ্ট, অন্নাভাব বর্ণিত হয় নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে। মানিক নির্মোহ ভঙ্গিতে তুলে ধরেন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের জীবনবাস্তবতা, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ও পরিণাম। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এমন ঘটেনি। তিনি মন্বন্তর পূর্ববর্তী শান্ত সচ্ছল পল্লীবাঙলার গৃহস্থজীবনের শ্রী ও মাধুর্যের বিবরণ রচনা করেন এবং ক্রমশ মন্বন্তরের বিষাক্ত দংশনে ওই মাধুর্য কীভাবে বিনষ্ট হচ্ছে তা নির্দেশ করেছেন। তিনি সনাতন সেবাপরায়ণ আত্মত্যাগী সহিষ্ণু ভারতীয় নারীদের গল্প বলেন। এ–উপন্যাসে যারা অনাহার নিশ্চিত জেনেও দুঃস্থ ক্ষুধার্তের পাতে খাদ্য তুলে দেয়, নানা রকম জোগাড়যন্তর করে স্বামী পুত্রকে অনাহার থেকে রক্ষা করে— তারা কল্যাণী, সহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী। ওই নারীদের তিনি দেখেন মুগ্ধ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে। রূঢ়, নির্মম ও প্রকৃত বাস্তবতার নিরাবেগ উপস্থাপনা করেন নি বিভূতিভূষণ। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অসহায় মানুষের শোক অসহায়তা বিপন্নতার করুণ কাহিনী দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে বিবৃত করেন। যেখানে দুর্ভিক্ষপূর্ব সচ্ছলতা স্বাভাবিক দৈনন্দিন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি, সেখানে তিনি সফল। গৃহস্থ জীবনের সুখ, দৈনন্দিন ক্রিয়া–কর্ম, অভ্যাস, প্রাত্যহিক খাদ্যাভ্যাস গৃহস্থালীর তিনি অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করেছেন, নির্দেশ করেছেন ওই জীবনের সহজ শ্রী ও মাধুর্য। আপাত নিস্তরঙ্গ ওই জীবনের আভ্যন্তর

স্রোত, ছোটখাট প্রাপ্তি, চাহিদা, কাজকর্ম, স্বপ্নপরিকল্পনা, ব্যর্থতা সাফল্যপূর্ণ সহজ গ্রামীণ জীবনের গল্পবলায় তিনি সফল। এই জীবনের পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সব কটি উপন্যাসে। বিভূতিভূষণ সাধারণত তুচ্ছ বাস্তবতার অনুপঙ্খ বর্ণনা দেন। তিনি নিম্নরূপে উপস্থাপিত করেন বাস্তবতা :

> অনঙ্গদের বাড়ী গোয়ালপাড়ার প্রান্তে, দুখানা মেটে ঘর। খড়ের ছাউনি, একখানা দোচালা রান্নাঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠানের ধারে ধারে পেঁপে ও মানকচু গাছ। চালে দিশি কুমড়োর লতা দেওয়া হয়েছে কঞ্চি দিয়ে, রান্নাঘরের পাশে গোটাকতক বেগুন গাছ, ঢেঁড়স গাছ। অনঙ্গ এসে দেখল বদ্যিনাথ কলু বড় একটা ভাড়ে প্রায় আড়াই সের খাঁটি সর্ষে তেল এনেছে। তেল মাপা হয়ে গেলে বদ্যিনাথ বললে–মা ঠাকরুণ, আজ আর সর্ষে দেবেন নাকি? –উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো। এখন এই তেলে একমাস চলে যাবে–[৫]

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দারিদ্র্য বাতাসের মতো স্বাভাবিক; এবং তিনি দারিদ্র্যদুরবস্থা নির্দেশ করেন সাধারণত খাদ্যের অভাব বা সামান্য খাদ্য ভোজনের তৃপ্তি বর্ণনা করে। নিচের উদ্ধৃতিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে :

১। পূর্ব্বদিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাক্রুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু–একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাক্রুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না?–ওই দ্যাখো।

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক পিতি, তুই খা–দুটো পাকা বড় বীচে কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাক্রুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ–মুখ উজ্জ্বল দেখাইল–সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।[৬]

২। তারপর এই দুর্দশার সংসারে বীণা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পড়ে, রাত্রে একমুঠা চাল চিবাইয়া জল খাইয়া সারারাত কাটায়।.....

আজকাল, বিপিনের চাকুরি হওয়া পর্যন্ত রাত্রে এক পোয়া আটার রুটি হয় বীণার জন্য। আগে এমন একদিনও গিয়াছে বীণা কিছু না খাইয়া রাত কাটাইয়াছে। আটা ময়দা কিনিবার পয়সা তো দূরের কথা, বাড়ীতে একমুঠো চাল থাকিত না যে ভাজিয়া খায়। আজকাল মনোরমাই এ-বন্দোবস্ত করিয়াছে। একসঙ্গে আটা আনিয়া রাখে, বীণার যাহাতে এক সপ্তাহ চলে। শাশুড়ী রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না, সহ্য হয় না। বীণা রাত্রে না খাইয়া কষ্ট পাইত, মনোরমা তাহা সহ্য করিতে পারিত না। সে অত্যন্ত গোছালো সংসারী মানুষ, তাহার সংসারে কেহ কষ্ট পায়, ইহা সে দেখিতে পারে না। তবে আজকাল আবার বলাইয়ের অসুখ লইয়া মুশকিল বাধিয়াছে, বীণার জন্য তোলা আটায় তাহাকেও রুটি করিয়া দিতে হয় রাত্রে। অথচ বেশি করিয়া আনিবার পয়সা নাই। বিপিন যে টাকা পাঠায় তাহাতে সবদিকে সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর। বেশী পয়সা চাইলেও বিপিন দিতে পারে না।

মনোরমা যেভাবে সংসার গুছাইয়া রাখিতে চায়, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবাই সুখে থাক, মনোরমার সেদিকে অত্যন্ত নজর।[৭]

৩। কেদার স্নান সেরে এসে খেতে বসলেন। পাথরের খোরায় বুক্‌ড়ি কালো আউশ চালের ভাত ও ডাঁটা চচ্চড়ি। খোরার পাশে একটা ছোট কাঁসার বাটিতে কাঁচা কলাইয়ের ডাল। কেদার নাক সিঁটকে বললে, কি ছাই-রাই-ই রাঁধিস রোজ, তোর রান্না নিত্যি খাওয়া এক ঝক্‌মারি।

শরৎ চুপ করে রইলো।

নীরবে কয়েকগ্রাস উদরস্থ করে ক্ষুধার প্রথম দিকের জ্বালাটা খানিকটা মিটিয়ে কেদার মায়ের দিকে তিরস্কার-সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আহা, কি ডাল রাঁধবার ছিরবা। আর এই একঘেয়ে ডাঁটা চচ্চড়ি, এ রোজ রোজ তুই পাস কোথায় বাপু।

-আমার কি দোষ, আমি কি বাজারে যাই না কি? যা পাই হাতের কাছে তাই রাঁধি। কে এনে দিচ্ছে বল না-

কেদার মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, তার মানে?
তার মানে কি শরৎ বাবাকে ভাল ভাবেই বুঝিয়ে বলতে পারত, ঝগড়ায় সেও কম যাবে না-কিন্তু বাবার মেজাজ সে উত্তমরূপে জানে, এখুনি রাগ করে ভাতের থালা ফেলে উঠে যাবেন এখন। সুতরাং চুপ করেই গেল সে।

কেদার পাতের চারিদিকে ডাল মাখা ভাত ফেলে ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো আগোছালো ভাবে আহার সম্পন্ন করে অপ্রসন্ন মুখে উঠে যাবার উদ্যোগ করতে শরৎ বললে-বসো বাবা, উঠো না, কিছু তো খেলে না, একটু তেঁতুল দিয়ে খেয়ে নাও-।[৮]

বিভূতিভূষণের পল্লী হচ্ছে এক ধরনের আর্কেডিয়া। যেখানে দারিদ্র্য সত্য; কিন্তু দারিদ্র্যকে স্নিগ্ধ করে রাখে মানুষের হৃদয় ও প্রকৃতির শোভা। তাঁর উপন্যাসে বাস্তবতা নির্মম নয়, তা মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে না। তা বরং মানুষকে জীবন-অভিলাষী করে তোলে। মনে হয় জীবন কতো মধুর। বিভূতিভূষণ যদিও সমকালের গল্প বলেছেন তবু তাঁর উপন্যাসের পল্লীকে অনেকটা কাল-নিরপেক্ষ পল্লী বলেই মনে হয় বা এই পল্লী হয়তো ছিলো মধ্যযুগে। ওই কাল-নিরপেক্ষ পল্লীর দরিদ্র সাধারণ গৃহস্থের পারিবারিক জীবনকথাই তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে যে পল্লীসমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তা কুৎসিত ও কদর্যতায় ভরপুর এক নারকীয় সমাজ। জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গি অ্যান্টিরোম্যান্টিক। পল্লীজীবন বা পল্লীর মানুষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে ওই জীবন স্নিগ্ধ, জটিলতাহীন, কলুষমুক্ত ও সরলসহজ; আর পল্লীর মানুষেরা অতিথিপরায়ণ, সরল ও আন্তরিক। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেন বিপরীতচিত্র। তিনি প্রতিটি উপন্যাসে দেখান যে পল্লীসমাজ ও মানুষ সম্পর্কে ওইসব ধারণা গল্পকথা মাত্র। তিনি পল্লীর নারকীয় রূপের চিত্র আঁকেন।তিনি দেখান পল্লীর মানুষ উদার, আন্তরিক, সরলসহজ, নিরীহ ও সৎ নয়। পল্লীসমাজ ও মানুষের জীবন নানারকম সংকীর্ণতা ও ইতরতায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে পল্লীসমাজের শ্বাসরুদ্ধকর সংকীর্ণতার পরিচয় তুলে ধরেন এবং বিচিত্র ধরনের ইতর চরিত্রের ক্রিয়া বর্ণনা করেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা মধ্যবয়সী বৃদ্ধ তরুণ যা-ই হোক না কেনো, প্রত্যেকেই ধুরন্ধর, অসৎ, নিষ্ঠুর, দুশ্চরিত্র ও মেরুদণ্ডহীন। বিভূতিভূষণের কাছে পল্লী হচ্ছে স্বর্গ আর জগদীশ গুপ্তের কাছে নরক। একই বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীতরূপে প্রতিভাত হয়েছে দুজনের কাছে। তবে বিভূতিভূষণ যেমন পল্লীকে নিরপেক্ষরূপে দেখেননি, জগদীশ গুপ্তও পল্লীকে নিরপেক্ষরূপে দেখেননি, জগদীশ গুপ্তও পল্লীকে নিরপেক্ষরূপে উপস্থিত করেননি। তিনি পল্লীর কালিমাময় বাস্তবতাকে উদঘাটন করেছেন। তার পল্লী শোভাময় নয়, প্রকৃতির রূপকথা রচনাও তাঁর লক্ষ্য নয়। ওই পল্লীর মানুষের সংকীর্ণতা নির্দেশ তাঁর লক্ষ্য। ওই পল্লীর মানুষেরা মানবিক নয়। জগদীশ গুপ্তের পল্লীসমাজ নীরন্দ্র ইতরতায় ভরা। ওই পল্লী-সমাজকে জমাট অন্ধকারে পরিপূর্ণ বলে মনে হয়। ওই জীবনে মহত্ত্ব নেই, প্রেম নেই, মনুষ্যত্ব নেই, সুকুমার মানবিক বৃত্তির উপস্থিতি নেই। ওই জীবনে কোমলতা, শুদ্ধ ধারণা, বিশ্বাস, ভালোমানুষ থাকার চেষ্টা মার খায় ইতরতার কাছে, অশুভের কাছে শুভ হার মানে এবং একাধিপত্য বিস্তার করে থাকে অশুভ।

জগদীশ গুপ্তের জগত ও মানুষ সম্পর্কে অনিলবরণ রায় বলেন, জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসে দেখান যে মানুষ 'একটি দুর্নিরীক্ষ্য আর অতিহিংস্র শক্তির হাতে অশক্ত ক্রীড়নক মাত্র।'[৯] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এক 'উদাসীন অদৃষ্ট শক্তি' মানুষকে চালিত করে জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে।[১০] মোহিতলাল মজুমদারের মতে জগদীশ গুপ্ত দেখাতে চান 'মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয়দৈব-নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে।'[১১] সুকুমার সেন বলেন, 'অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে, .... মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক ''আধুনিক'' লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণ্য বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখাননাই, ... তিনি কিছুকেও, তবে জগদীশ গুপ্তের জগৎ দৈবনিয়ন্ত্রিত নয়, তা সহজাতভাবে দূষিত মানুষের জগৎ, যারা আকস্মিক ঘটনা ও পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাহাকে দায়ী না করিয়া যে হিংস্র অন্ধ শক্তি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন।'[১২] জগদীশ গুপ্তের জগৎ ও মানুষদের চারিত্র্য নির্দেশ প্রসঙ্গে ড. অশ্রুকুমার সিকদার বলেন, ''হিংস্র পাশবিক নীচতায় ভরা এই জগতের মানুষগুলির ঈর্ষা ও অর্থগৃধ্নুতা যেন সহজাত ধর্ম।'[১৩] তাঁর মতে জগদীশ গুপ্ত 'দেখিয়েছেন মানুষের স্বভাবের দৈন্য কদর্যতা নোংরামি, দেখিয়েছেন জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনের শক্তি বারেবারে মানুষের অমানুষিত নীচতা ও ইতরতার কাছে কীভাবে পরাভব মানে। মানুষ সম্বন্ধে এক গভীর অশ্রদ্ধাই তাঁর রচনার প্রধান লক্ষণ। মানুষের মহিমা নয়, মানুষের মহিমাহীনতাই তার বিষয়।'[১৪] অশ্রুকুমারের এই ব্যাখ্যাই যথার্থ। জগদীশ গুপ্ত পল্লীকে নরকরূপে দেখেছেন এবং তার চিত্রই অঙ্কন করেছেন।

''লঘুগুরু''র (১৩৩৮) পাত্রপাত্রী বিশ্বম্ভর, উত্তম, বিশ্বম্ভরের আত্মীয় লালমোহন, কন্যা টুকী, টুকীর স্বামী প্রৌঢ় পরিতোষ, রক্ষিতা সুন্দরী, বিশ্বম্ভরের গ্রাম্য বন্ধু ও প্রতিবেশীবৃন্দ। জগদীশ গুপ্তের এ-উপন্যাসে পাপাচার ও ইতরতায় পরিপূর্ণ এক ভণ্ড পল্লীসমাজের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। বিপত্নীক গৃহস্থ বিশ্বম্ভর অন্য পল্লী থেকে একজন পতিতাকে ঘরে এনে তোলে। সমাজে সকলে এ-ব্যাপারটির নিন্দা করে ঠিকই, তবে নিঃশব্দে অনুমোদনও করে। ওই সমাজের একজন পুরুষ একজন পতিতাকে রক্ষিতারূপে রেখে সমাজে বাস করতে পারে এবং দশজনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কও তার বজায় থাকে। ওই সমাজ শিথিল, অন্যায় ও অসদাচরণকে প্রশ্রয় দেয়। ইতরতা ওই সমাজের সাধারণ ধর্ম।

পাপাচার ওই সমাজে গর্হিত কর্ম বলে নিন্দিত হয় না। পল্লীবাসী নারীরা মুখরা, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্রূর ও কলহপরায়ণ। বিশ্বম্ভরের মুখরা নারী প্রতিবেশীরা উচ্চকণ্ঠে রক্ষিতা উত্তমের কুৎসা রটনা করে আর সমাজের সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কা করে। এমন কী বিশ্বম্ভরের শিশুকন্যাকে মায়ের চরিত্রহীনতার সংবাদ জানাবার জন্য তারা ব্যগ্র হয়ে ওঠে। জগদীশ গুপ্ত ওই ইতরতাকে নির্দেশ করেন এভাবে:

> 'হাসিতে হাসিতে একটি নিদারুণ কথা, সাপের বিষ-দাঁতে যেমন বিষ জমে তেমনি, মোক্ষর মায়ের জিহ্বাগ্রে আসিয়া জমিল-মোক্ষর মা অনুভব করিতে লাগিল, একটি স্থানে সেই সঞ্চিত বিষ ঢালিয়া বিষের ভাণ্ড উজাড় করিতে না পারিলে যেন সে নিজেই বাঁচিবে না।
>
> মোক্ষর মা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। টুকীর হাত ধরিয়া তাহাকে একটু দূরে লইয়া গেল, তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল,- তোর
>
> মা বেশ্যে ছিল; গয়না দিয়েছে হাজার লোকে-তোর এ বাবা দেয়নি। যা শুদোকে তোর মাকে।-তারপর টুকীর মাথার উপর হাত রাখিয়া সস্নেহকণ্ঠে বলিল-শুদোস, বুঝলি।[১৫]

আবার ওই নারীরা ধনী রক্ষিতাটির স্বর্ণালঙ্কার ও অর্থকড়ির কথা স্মরণ করে ঈর্ষাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং গোপনে গোপনে অর্থ সাহায্যের জন্য ওই রক্ষিতার কাছে হাতও পাতে। পাওনাদার হিসেবে উত্তম উদাসীন ও উদার বলে গৃহস্থ নারীরা তার সুনাম রটাতে ব্যগ্রও হয়ে পড়ে। একই রকম দুশ্চরিত্র ওই সমাজের পুরুষগুলো। রক্ষিতা হিসেবে ঘরে এনে তুললেও বিশ্বম্ভর ওই নারীকে পুরস্ত্রীর মর্যাদা দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। বিশ্বম্ভরের ইয়ার বন্ধুরা ওই নারীটিকে উপভোগের সুযোগ সন্ধান করতে থাকে। নানা ছুতায় এসে বাড়ির ভেতরে ঢোকে।

ওই সমাজ পরশ্রীকাতর ও অসততায় পরিপূর্ণ। অকারণ গোপন শত্রুতা করে ওই সমাজের মানুষ পরম সুখ পায়। অন্যের সুখ ও সাফল্য তাদের ঈর্ষান্বিত করে তোলে। প্রতিবেশীর জীবনকে অশান্তিগ্রস্থ করে তোলার চক্রান্তে লিপ্ত থাকে নানাজন। বিশ্বম্ভরের কন্যা টুকী রূপেগুণে চমৎকার হলেও সৎপাত্রে তাকে সমর্পণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ প্রতিবেশীরা পাত্রপক্ষকে উড়োচিঠি দিয়ে কন্যার পিতার রক্ষিতা রাখার সংবাদ ফাঁস করে দেয়। ফলে বিয়ে ভেঙে যায়। বিশ্বম্ভর, উত্তম ও টুকির পারিবারিক জীবন-বাস্তবতা উপস্থাপনার পাশাপাশি জগদীশ গুপ্ত সমগ্র

সমাজের ওপরও আলোকপাত করেন। ওই সমাজ পাপাচারের অন্ধকারে পরিপূর্ণ এবং ক্লেদাক্ত। সমাজের সদস্যরা বিবেকবোধ শূন্য। ক্লেদ ও কলুষময় জীবনে তারা এতোই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, ওই জীবনকেই তারা সত্য বলে মানে। কোনো গ্লানি বা লজ্জা বোধ করে না পাপাচারপূর্ণ ক্লেদাক্ত ওই জীবনের জন্য। দেখা যায় ওই সমাজে যৌবনে স্ত্রী বিয়োগের পর ত্রিশ বছর ধরে পুরুষ রক্ষিতার সঙ্গে ঘর করে। বাস করতে থাকে রক্ষিতার বাসগৃহে। ডোমপাড়ার নারীরা একই সঙ্গে গৃহস্থ বউ ও পতিতা। তারা দিনে-রাতে দু'রকম জীবন যাপন করে। ওই পাড়ার বিধবা বউ-ঝিয়েরা অবৈধ সন্তানসম্ভবা হলে, প্রকাশ্যে হাতুড়ে দাই ও কবিরাজের শরণাপন্ন হয় অভিভাবকেরা। তাদের অর্থনৈতিক জীবনের বর্ণনা এমন:

> কে যেন সুন্দরীকে তল্লাস করিয়া ডাক দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল,-মা রয়েছিস গো? ডাক শুনিয়া সুন্দরী এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টুকীও বাহির হইয়া আসিল। আঁচলের টাকা দশটি বাঁধিতে বাঁধিতে সুন্দরী আগন্তুক রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর? খালাস হয়েছে ?
>
> -না, মা, আর সামলাতে নারছি-বলিয়া বিপন্না রমণী এক ফোঁটা অকপট অশ্রু ত্যাগ করিল।
> -খাইয়ে ছিলি?
> -দু'বার খৌয়াইছি।
> উহারই দুশ্চিন্তার ছোঁয়াচ সুন্দরীর মুখেও লাগিল, বলিল,
> -বেঁধেছে কেউ নিশ্চয়ই।
> -কে বাঁধবেক, মা, সত্তুর অমন কেউ নাই।
> ঔষধ ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে, যাহাকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহারই উপর, সুন্দরী রাগিয়া উঠিল-তোরা ছোটলোক ত ছোটলোকই, ছোটলোকের হদ্দ-ডোম কিনা। নড়ে?
> মাথা নাড়িয়া রমণী বলিল-হ্যাঁ, মা, লড়ে
> - সেঁকে ছিলি?
> -না।[১৬]

সন্ধ্যায় ওই পল্লীর কারো না কারো ঘরে বসে খোল করতাল ও কীর্তনের আসর। পয়সার প্রয়োজনে প্রৌঢ় মাতাল সাধক সেজে ধর্মসাধনা শুরু করে, আশানুরূপ আয় করতে ব্যর্থ হলে রক্ষিতার পরামর্শে বরপণ পাবার লোভে বিবাহ করে। শ্বশুরের রক্ষিতা আছে জেনে স্বস্তি পায়, শ্বশুরের সামনে নিজের রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটিও খোলাখুলি বলতে বাধে

না। অর্থাৎ চক্ষুলজ্জা শালীনতাবোধশূন্য ওই মানুষগুলোর জীবন চরম ইতরতায় পূর্ণ। পণ হিসেবে পাওয়া টাকা কড়ি গহনা কাপড় সিদেঁল চোর চুরি করে নিলে বাবার কাছ থেকে বউকে টাকা আনার জন্য চাপ দেয়া হতে থাকে। এমন কী রক্ষিতা ও স্বামী মিলে কিশোরী বউটিকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করারও সিদ্ধান্ত নেয়। এ-উপন্যাসে পল্লী কুৎসিত এবং তার মানুষেরা পাশবিক; জগদীশ গুপ্তের বর্ণনায় পল্লী হয়ে উঠেছে এক অনৈতিক নরক।

জগদীশ গুপ্তের ''মহিষী'' (১৯২৯) উপন্যাস পল্লীর এক কূটকৌশলী, অর্থগৃধ্নু মামলাবাজ ও সুদখোর মহাজন ব্রজকিশোরের পারিবারিক বৃত্তান্ত। ব্রজকিশোর প্রবল বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। সে গ্রামের নকড়ি ঘোষের তেজারতি সেরেস্তার হেড মোহরার। 'ভাগ লইয়া, বখ্‌রা লইয়া, দস্তুরী লইয়া, ঘুষ লইয়া ব্রজকিশোর আজ টাকার মানুষ।'[১৭] একমাত্র পুত্র অশোক মোক্তারী পড়ে। পিতা পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করতে থাকে, 'অপুত্রক কিন্তু সকন্যা কোনো ভূসম্পদশালী' ঘরেই পুত্রের বিয়ে দিতে চায় পিতা। পুত্র পিতার পছন্দ মতো কালো মেয়েকে বিয়ে করতে অসম্মত হলে পিতা কৌশলে পুত্রকে রাজি করায়। পিতা ভান করে যাবতীয় সঞ্চয় ও ভদ্রাসন ইত্যাদি ধর্মাশ্রমে দান করে তীর্থে যাবার প্রস্তুতি নেয়। পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে অশোক বিয়েতে রাজি হয়। বিয়ের পরে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হলেও পিতার কি ভণ্ডামীর কথা শুনে স্ত্রীর ওপর তার মন বিরূপ হয়। নানাভাবে সে স্ত্রীকে অপমান করে। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না মেয়ে জ্যোতি পিত্রালয়ে চলে গেলে অশোকের পৌরুষ আহত হয়। তার মনে হয় ধনী কন্যা বলেই জ্যোতি এমন অবাধ্যতা ও অপমান করার সাহস পেয়েছে। স্ত্রীর নামে জঘন্য অপবাদ রটায় অশোক, পুরো গ্রামের মানুষ এ অপবাদ নিয়ে মেতে ওঠে। জ্যোতির পিতা এ কথা শুনতে পায়। জ্যোতি সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামীগৃহে আসে কিন্তু পুণর্বার স্বামী তাকে অপমান ও প্রত্যাখ্যান করে। জ্যোতির মন স্বামীর ওপর বিরূপ হয়, এক সময় স্বামী সদ্ভাব করতে এগিয়ে এলে জ্যোতি তাকে গ্রহণ করতে পারে না। অহং-এ আঘাত লাগে বলে অশোক আবারো ক্ষিপ্ত হয়। পুত্রকে সুখী করার জন্য এবং জ্যোতির পিতার কাছ থেকে ভূসম্পদ পাবার সম্ভাবনা শূন্য দেখে পিতামাতা অশোকের পুর্নবার বিয়ে দেয়। সুন্দরী দরিদ্র কন্যা নন্দরানীকে পেয়ে অশোক সুখী হয়। জ্যোতি পিতৃগৃহে ফিরে যায়। জ্যোতি ওই সমাজের ব্যতিক্রম একটি নারী। সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সৎ ও ভালোমানুষ। এ কারণেই তাকে সহ্য করতে হয়

ইতর সমাজের দেয়া অপবাদ ও লাঞ্ছনা। অপমানিত হয়ে নিজেকে সে লুকায় পিতৃগৃহকোণে।

এ–উপন্যাসে আছে সমাজ বাস্তবতার নানা অংশের পরিচয়। ওই সমাজ কলুষ ও ইতরতায় পরিপূর্ণ। একজন ধূর্ত কর্মচারী কিভাবে মনিবের উদাসীনতার সুযোগে ধনশালী হয়ে ওঠে তার বিবরণ পাওয়া যায় এ–উপন্যাসে। সম্পদশালী হওয়াই তার লক্ষ্য, মনিবের বিশ্বাসের মর্যাদা না দিয়ে নানাভাবে সে অর্থ আত্মসাৎ করতে থাকে। যেকোনো ভাবে ধনশালী হওয়াই তার উদ্দেশ্য, তাই বিবাহযোগ্য পুত্রের পাত্রী খোঁজার সময় সে লক্ষ্য রাখে কন্যার পিতার আর্থিক অবস্থা, তার ভূসম্পদের নিষ্কন্টকত্ব, উত্তরাধিকার এর সংখ্যা। কন্যার পিতার আর্থিক সচ্ছলতার কাছে গৌণ হয়ে যায় কন্যার গাত্রবর্ণ। কালো মেয়ে ঘরে তোলায় তার আপত্তি থাকে না। পুত্র আপত্তি জানালে পুত্রকে বশ করার জন্যে পিতা মিথ্যাচার করতে কিংবা কূট কৌশল প্রয়োগে দ্বিধা করে না। পুত্রও অর্থসম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার চাইতে কালো মেয়ে বিয়ে করাকেই অধিক বিচক্ষণতার কাজ বলে মনে করে। কালো মেয়ে বিয়ে করার সকল আপত্তি উঠে যায়।

ওই পল্লীসমাজ পরছিদ্রান্বেষী, যে কোনো মিথ্যা রটনায় সিদ্ধ, মানুষগুলো ইতর ও ক্ষুদ্র। সামান্য মনোমালিন্যের কারণে নবপরিণীতা বধূ বাপের বাড়ি গেলে গ্রামের কেউই বাপের বাড়ি যাবার পেছনে এতো সামান্য কারণ আছে বলে বিশ্বাস করে না। অশোকের বন্ধুস্থানীয়রা তৎপর হয় আসল কারণ অনুসন্ধানে। স্ত্রীর কালো রঙ অশোককে ক্ষিপ্ত করে, সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রবল আত্মমর্যাদাবোধও তার কাছে অসহ্যবোধ হতে থাকে। এমন কী সে নিজেও স্ত্রীর নামে জঘন্য অপবাদ রটাতে কুণ্ঠিত হয় না। 'স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া গেছে–ওটাকে সে পদাঘাতের তুল্য অপমানকর মনে করিয়া' স্ত্রীর নামে রটায় জঘন্য অপবাদ। সে বলে তার স্ত্রী জ্যোতির 'প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, আর ঘেন্না বলে কোনো আচরণ তার নেই, হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যমান।'[১৮] আর তার বন্ধু গগনের মানসিকতা এমন : 'কুৎসার ঘ্রাণ পাইয়া গগনের মানবাত্মা উৎসুক্যে খাড়া হইয়া উঠিল' এবং অশোকের 'স্ত্রীর সম্বন্ধে ইতর একটা কল্পনা যেন উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া তার প্রাণের আবরণটাকেই ঝমঝম করিয়া নাচাইতে লাগিল।'[১৯] ''মহিষী'' উপন্যাসে ইতর পল্লী-সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে।

''দুলালের দোলা'' (১৩৩৮) উপন্যাসে একটি তরুণের দৃষ্টিতে দেখা পল্লীসমাজের কদর্যরূপ অঙ্কিত হয়েছে। এ–উপন্যাসের পাত্রপাত্রী—

নীরদবরণ, পিসীমা, সতীশ, কন্যা নির্মলা, মুনিষ পীরু, গ্রামের পড়শী বাবাঠাকুর মনীশ প্রমুখ। পূজা অর্চনা, সুরুচি সংস্কার, দোসরা অতিথি সৎকার দান, আশ্রিতজনের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সুন্দর প্রথা-আচার পূর্ণ যে পল্লীসমাজজীবনের ধারণা আমাদের মনে আছে, জগদীশ গুপ্ত এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেন তার রূপ। তিনি দেখান ওই আচার প্রথাপূর্ণ শান্ত শ্যামল প্রকৃতিবেষ্টিত সমাজ–মানুষ ধীর, সুশীল, উদার, নীতিপরায়ণ, ধার্মিক ও নিরীহ নয়। তারা অজ্ঞ, সংকীর্ণ,ইতর ও দুর্দমনীয় রিপু তাড়িত; ঈর্ষা ও প্রতিশোধস্পৃহা তীব্র তাদের। ব্যাভিচার ওই জীবনে সাধারণ ব্যাপার, অন্যের যে–কোনো ব্যাপারে নাক গলানো ও নির্লজ্জ অশোভন কৌতূহল তাদের মজ্জাগত। তাদের জীবন নীরন্ধ্র ইতরতায় পরিপূর্ণ। ওই পল্লী সমাজের মানুষদের নির্লজ্জ ইতরতা সংকীর্ণতা ও আত্মসম্মানবোধহীন জীবন–বাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে এ উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ নির্ভর উপন্যাসে দেখা যায় এমন ইতর, ক্রুর, অভিসন্ধিপরায়ণ ও নির্লজ্জ দু একজন মানুষ পল্লীজীবনে আছে। বাকি সবাই অতিথি–পরায়ণ, শান্ত, ছা পোষা গৃহস্থ ও ভালোমানুষ। নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম পালাপার্বণ ও সামাজিকতার মধ্য দিয়ে তারা জীবন কাটায়। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে দেখা যায় পল্লীবাসীরা নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম পালাপার্বণ সামাজিকতা ঠিকই পালন করে, তবে মানবিক সৎগুণগুলোর উপস্থিতি তাদের কারো মধ্যে নেই। তারা অত্যন্ত ইতর ধরনের মানুষ, প্রত্যেককেই তাড়িত করে স্বার্থবোধ। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে অকুণ্ঠিত একেকজন, অশোভন তাদের কৌতূহল, অশালীন তাদের আচার আচরণ। ওই সমাজের মানুষের হীনতা দৈন্য নোংরামি নীচতা ও ইতরতার পরিচয় এ–উপন্যাসের নানা ঘটনা ধারণ করে আছে।

''দুলালের দোলা''–র নায়ক নীরদবরণ স্বগ্রামে বেড়াতে আসে। নিজের গ্রামের নাম কেনো 'পোড়া বৌ' তা জানতে চেয়ে সে শোনে এক 'বীভৎস ইতরতার গল্প'। নীরদের পিতামহের সময়ে গ্রামের এক ব্রাহ্মণের ধনীপুত্র ভারত বিদেশ থেকে নিজের গ্রামে বেড়াতে এসে কাজের মেয়ে স্বর্ণর প্রতি আসক্ত হয়, তাকে সন্তানসম্ভবা করে, স্বামীর ইতরামোর প্রমাণ পেয়ে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী গিরিবালা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তাই লক্ষমীদিয়া গ্রামের নাম হয়ে যায় পোড়া বৌ। এ–ঘটনার মধ্যদিয়ে নীরদ ওই গ্রামের অতীতকলুষের সঙ্গে পরিচিত হয়, গ্রামের বিভিন্ন সদস্যের সঙ্গে পরিচিত হবার মধ্য দিয়ে তার পরিচয় ঘটে ওই সমাজের বর্তমান কলুষের সঙ্গে। সে দেখে বর্তমান পল্লীসমাজ আরো কলুষযুক্ত। তার সঙ্গে

পরিচয় ঘটে পোড়া বৌ-এর স্বামীর রক্ষিতাবংশের উত্তরপুরুষ সতীশের সঙ্গে, নীরদের পিতামহের ধর্মভাইয়ের পৌত্র মনীশ ও তার ইয়ারদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, পরিচয় ঘটে গ্রামের উগ্র ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরের সঙ্গে। পল্লীর ওই মানুষদের প্রত্যেকের জীবন অপরিমেয় কলুষ ও ইতরতাপূর্ণ। সতীশ বিকারগ্রস্ত মেরুদণ্ডহীন ও আত্মমর্যাদাবোধশূন্য। নিজের পিতামহীকে অসতী জেনে এবং পূর্বপুরুষের কলুষময় জন্মবৃত্তান্ত জেনে সতীশ হয়ে ওঠে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। নিজের স্ত্রীকে সে সন্দেহ করে এই অজুহাতে যে 'পিতামহী যার অসতী, তার স্ত্রী সতী হবে কেমন করে।' নারীমাত্রকেই সে দুশ্চরিত্র বলে গণ্য করে, নিজের কিশোরী কন্যাকেও সে ভ্রষ্টা বলে মনে করে। দিনে দুপুরে মধ্যরাতে সে প্রতিবেশীদের বাড়ির আনাচেকানাচে কানপেতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ তার নামে কলঙ্ক রটাচ্ছে কিনা শোনার জন্য। এই আড়িপাতার কারণ হিসেবে সে বলে, 'আমি যে জারজের বংশধর তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু সেই মেয়েটার কথা মনে পড়লেই মনে হয়, শুনে আসি কেউ কুৎসো করছে কিনা।' [২০]

ওই সমাজের মানুষ সৌজন্যবোধশূন্য, অজ্ঞা ও অশালীন। পিতামহের ধর্মভাইয়ের পৌত্রের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে সমাজের মানুষের এই নোংরামি ও অশালীনতা নীরদের চোখে পড়ে। অচেনা ধর্মভাই মনীশ রায় দেখা হওয়া মাত্র কপট আন্তরিকতায় গলা জড়িয়ে ধরে অল্প সময়ের মধ্যে তুই তোকারি করে অতি নিকটজন হয়ে ওঠার কপট আন্তরিকতা প্রদর্শন করে। আবার অতিথিকে উপেক্ষা করে ইয়ারদের সঙ্গে স্থূল অশ্লীল অরুচিকর গানবাজনায় মেতে ওঠে। নীরদ অব্রাহ্মণ বলে সে নিমন্ত্রিত অতিথি হওয়া সত্ত্বেও আহারকালে বাগদীর সঙ্গে বসতে দেয়। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একসারিতে ও একস্থানে বসতে দেয় না। পরিবেশনের সময় অতিথিকে উপেক্ষা করে নিজেদের পাতেই ভালো খাবার তুলে নেয়, কারণ তারা ব্রাহ্মণ। ওই সমাজের শাস্ত্র বা ব্রাহ্মণ আচার অনুসারে, 'ব্রাহ্মণ ভোক্তা থাকিতে অব্রাহ্মণের পাতের সম্মুখে খাদ্যের পাত্র অবনত করিতে নাই-করিলে নাসিকায় ঘ্রাণ প্রবেশ করিয়া এবং চোখের দৃষ্টি পড়িয়া খাদ্যবস্তু উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়।'[২১] ওই ব্রাহ্মণেরা এতোই সংকীর্ণতাগ্রস্ত ও সৌজন্যবোধহীন যে আহারের শেষে অতিথিকেই বাসনপত্র মেজে দিয়ে যেতে বলে। তবে ওই আদেশ দেবার সময় তারা কপট বিনয় দেখাতে ভোলে না। কপট বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'না বলে আর পারলাম না, ভাই। আমাদের ঝিটা বাইরের ঝি; সে সন্ধ্যে বেলাই চাল আঁচলে বেঁধে নিয়ে পালায়। মা বুড়ো মানুষ আর তার শ্লেষার ধাত। রাত্তিরে চান করলে তিনি

রাত্তিরেই মরে যাবেন আর এই দেশটায় এমন ছিঁটকে চোরের উপদ্রব যে বললে তুমি বিশ্বেস যাবে না ....... বাসন ক'খানা বাইরে পড়ে থাকলে চোর নিয়ে যাবে। তুমি ত আমার পর নও, মায়ের পেটের ভাইয়ের মত একেবারে। যদি ...'[২২] কপটতা ও ভণ্ডামি ওই সমাজের মানুষদের মজ্জাগত। তারা প্রায় সকলেই ফন্দিবাজ খল ও আত্মমর্যাদাবোধশূন্য। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত সতীশ নিমন্ত্রণ থেকে ফিরেই কন্যাকে প্রহার শুরু করে। নিমন্ত্রণ কর্তা মনীশ মেয়েটিকে রক্ষা করতে এলে ক্রুদ্ধ সতীশ পাগলামির ভান করে মনীশকেও ঠেঙিয়ে দেয়, কারণ মনে মনে সে সন্দেহ করে যে মনীশ তার কন্যাকে নষ্ট করেছে। নীরদ দেখে এমন অপমানিত হয়েও মনীশ সতীশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করছে না বরং পরদিন ভোরে মনীশ ও তার মা এসে সতীশের সঙ্গে ভাব করে নেয় কারণ মনীশের পাত্রী দেখতে যাবার সময় সতীশ না গেলে ঠকার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তাই সতীশ খেপে মারামারি বাধালে 'মনীশ আর মনীশের মায়ের বিপদ হল ভারি। আর কারু ওপর তাদের বিশ্বেস নেই। সতীশ কথাবার্তার ভুল শুধরে দেবে, ওদিকে অল্পবিস্তর খানসামার কাজও করিয়ে নেবে–বন্ধু ভাবেই ...। কিন্তু এমন ধারা কাজের লোক সে ছাড়া গাঁয়ে আর নাই। মনীশের মা দেখলো, সতীশ না হলে বুঝি বিয়েই ফস্কে, তখন মায়েপোয়ে পরামর্শ করে মা গিয়ে সতীশের হাত ধরে বাপুবাছা বলে রাজি করেছে।'[২৩] তারই পরিণামে আগের রাতে প্রহৃত হওয়া সত্ত্বেও মনীশ সতীশের হাত ধরে সকালে কন্যা দেখতে চলে। অর্থাৎ যেকোনো উপায়ে স্বার্থসিদ্ধিই ওই মানুষদের কাছে বড়ো কথা। আত্মসম্মানবোধ ঘৃণা প্রভৃতি আবেগ তাদের কখনোই আলোড়িত করে না অর্থাৎ তারা যাপন করে এক ধরনের পাশব জীবন।

নীরদ দেখে গ্রামের উচ্চবর্ণের অন্যান্য ব্রাহ্মণের জীবনও একই রকম ইতরতাপূর্ণ ও বিনষ্টিগ্রস্ত। গ্রামের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত দ্বারিকঠাকুরের শীতের বেলায় পূজাআহ্নিক সারতেই 'বেলা তিন প্রহর হয়ে যায়' এবং 'খেয়েদেয়ে উঠতেই সন্ধ্যে'। আচার পালনে নিষ্ঠাবান হলেও ধর্ম ওই ব্রাহ্মণের বাইরের ব্যাপার মাত্র, ভেতরে সে অসৎ ও ভণ্ড; গ্রামের চোরের দলের ভাণ্ডারী সে। ঘুষ দিয়ে থানার মুখ বন্ধেরও শক্তি রাখে সে, দুশো সিঁদেল চোর তার হাতে। গ্রামের সকলেই জানে তার সঙ্গে বুজতে যাওয়া সহজ নয়। অত্যন্ত সতর্ক আচরণ করে শ্রদ্ধা দেখাবার ভণ্ডামী করে তাকে গ্রামবাসীরা তুষ্ট করে। অর্থাৎ সাধুসজ্জনরূপে খ্যাত পল্লীসমাজের ব্রাহ্মণের সাধুবেশ তার ছদ্মবেশমাত্র। এইসব কপটদের ভণ্ডামী ও ইতরতা পল্লীসমাজকে গভীরভাবে কলুষিত করে তুলেছে। ওই কলুষ ওই সমাজে

বহুদিন ধরে জমাট বেঁধে আছে এবং তা থেকে সমাজের মুক্তির কোনো উপায় নেই। এ-উপন্যাসে বাস্তবতা অবিকল উপস্থাপিত হয়নি। এ-উপন্যাসের নানা ঘটনার বাস্তবতা প্রসঙ্গে পশুপতি ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করি-এ সব ঘটনা কি সত্য বা সম্ভাব্য বলে মেনে নিতে হবে?'[২৪] এ-প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদার বলেন, 'মনে হয় বাস্তবতার সমস্যাটা জগদীশচন্দ্রের কাছে তত জরুরি ছিল না, তার কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল মানুষের সহজাত ইতরতার রূপায়ণ।'[২৫]

''রোমন্থন'' (১৩৩৮) উপন্যাসটিতে পাওয়া যায় দুটি পটভূমি। প্রথম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায় কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের জীবনের খণ্ডিত পরিচয়। অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলোতে রয়েছে কলকাতা থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরবর্তী মাননগর গ্রামের জীবনের পরিচয়। উচ্চবিত্তের জীবনের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হলেও ওই জীবনের চিত্রণ ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য পল্লীজীবনের রূপ অঙ্কন। কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের তিন ভাই বিলেতপ্রবাসী ধনবান অবিবাহিত জ্যেষ্ঠতাতের আদেশে তাদের বহুকাল পরিত্যক্ত গ্রামের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য বসবাস করতে যায়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে তিন ভাইয়ের গ্রামে যাওয়ার প্রস্তুতির কৌতুককর বিবরণ দেয়া হয়েছে। উপন্যাসে অখণ্ড কোনো কাহিনী নেই। লেখক ঘটনা-পরম্পরায় পল্লীজীবনের বাস্তবতাকে বিধৃত করেছেন।

ওই তিন ভাইয়ের চোখে গ্রামজীবন যেভাবে ধরা পড়েছে লেখক তারই উপস্থাপনা করেছেন। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে গ্রামীণ সমাজ কলুষময় ও ইতরতাপূর্ণ। নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই লেখক গ্রামীণ জীবনের পরিচয় পরিস্ফুট করেছেন। অভয়, কালোশশী, প্রাণনাথ, মাধবী, ভুলুদাস, জয়নাব, মদন—পল্লীর এই চরিত্রগুলোর দৈনন্দিন জীবনের দৈন্য, শোষণ, বঞ্চনা, কলহবিবাদ, স্বার্থপরতা, ক্রূরতার খণ্ড খণ্ড ছবি আঁকা হয়েছে। ওই সমাজ ক্ষুদ্রতা ও ইতরতায় ভরা। অকারণ কলহ, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকে মানুষেরা, এ ব্যাপারগুলো তাদের বেঁচে থাকার আনন্দের ভিন্নরূপ। পল্লীসমাজের খণ্ডচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি লেখক একটি সংসারের চিত্রও তুলে ধরেন। অভয় ও মাধবীর ওই সংসারে অভাব প্রকট, মহাজনের কাছে আকণ্ঠ ঋণী অভয়। স্বামীর ব্যর্থতা ও দারিদ্র্যে মাধবীকে কলহপরায়ণ ও নিষ্ঠুর করে তোলে। যে পল্লীসমাজের পরিচয় তুলে ধরেছেন জগদীশ গুপ্ত সেখানে অর্থনীতিক চাপে জীবন নিষ্পেষিতা। সহিষ্ণুতা,

মমতা, সততা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর উপস্থিতি ওই জীবনে নেই। পল্লীর অধিবাসীরা সর্বদাই কাংস্য এবং মৃৎপাত্রের মতো 'পরস্পরের সঙ্গে' অবিরাম ঠোকাঠুকিতে মত্ত এবং পরিণামে 'একজনের গাত্রে অনিবার্য্য ছিদ্র হওয়া' স্বাভাবিক নৈমিত্তিক ব্যাপার।'[২৬] তাদের জীবনে যে ধরনের সমস্যাই দেখা দিক না কেন, তার প্রত্যেকটিই অর্থনীতিক সমস্যা। লেখক এর ব্যাখা দিয়েছেন এ-রকম:

> যাহার সুপারি চুরি গিয়াছে, ঐ সুপারি ক'টিই ছিল তার অন্তত এক সপ্তাহের নুন তেলের সংস্থানের উপায়; সুপারি পয়সায় পাঁচটি। গগণ প্রামাণিক বনাম বদনচন্দ্র মামলাতেও তাহ-ঐ পেটের দায়, মদন নির্দ্দোষ গরুকে লইয়া খোঁয়াড়ে দিয়া কিঞ্চিতৎ নুন তেলের পয়সা করিয়াছে-এবং মদনের পাঁচ আনা অপব্যয়িত না হইলে ঐ পাঁচ আনায় কত কি যে হইতে পারিত তাহার ইয়াত্তাই নাই। ফর্দ্দ করিয়া লটকানা দোকানে দিলে ঐ পাঁচ আনায় পঁচিশটি ছোটবড় মোড়ক পাওয়া যাইত। স্ত্রীর সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া যাহাকে
>
> শ্যালকেরা পথে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে সে ভাবিতেছে, স্ত্রীর ঐ পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশ তাহার আয়ত্তে থাকিলে তার অভাব কমিবে, শ্যালকেরা ভবিতেছে, ভাগিনীর ঐ অংশটুকু যে-সে করিয়া লিখিয়া লইতে পারিলেই কিছু আয় বাড়িবে। আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু এককণা তাহাদের কাহারো ভাণ্ডারে নাই, মনের ভুলেও নাই, যাহার যতটুকু থাক ততটুকুই অমূল্য ও অত্যাজ্য, মনের তরতিব ভাঙ্গিয়া তাহাতেই তার পাগল পাগল ঠেকে। তাহাদের অবিরাম মনে হয়, যেন কাহারো অনুপস্থিতির সুযোগ আসিয়া বসিয়াছে, সে আসিলেই উঠিয়া যাইতে হইবে; তাই তাহাদের ধৈর্য্য এত কম।[২৭]

কলকাতার উচ্চবিত্ত তিন বাবুর সামনে পল্লীসমাজের যে পরিচয় ফুটে ওঠে তা কুৎসিত, ইতরতাপূর্ণ। শঠতা ও হিংসা, বিবাদ বিসম্বাদ পাপাচার ওই জীবনের বৈশিষ্ট্য। মুসলমান চাষী জয়নাবের স্ত্রীকে তার ভাইয়েরা আটকে রাখে কারণ ওই মহিলা উত্তরাধিকার সূত্রে পৈত্রিক জমিজমার ভাগ পেয়েছে; ভাইয়েরা ওই সম্পত্তি বোনের কাছ থেকে নিজেদের নামে লিখিয়ে নিতে চায়। তাই বোনকে তারা স্বামীগৃহে যেতে না দিয়ে আটকে রাখে। তিন বাবুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ব্রাহ্মণ প্রাণনাথ ঠাকুরের। বাবু তিনজনকে আশীর্বাদ করতে আসা তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যে হলেও প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ব্রাহ্মণ হিসেবে প্রণামী আদায় করা এবং ওই ব্রাহ্মণ সুকৌশলে গায়ের চাদরে সরিয়ে নিজের ব্রাহ্মণত্ব জাহিরের জন্য উপবীতটি

প্রদর্শন করে। ব্রাহ্মণ হলেও প্রাণনাথ ঠাকুর কুচক্রী ও শঠ। টাকা খেয়ে সে সুবিধা মত শাস্ত্রীয় বিধিবিধান ওই সমাজে প্রচলন করে।সে ইচ্ছে করলেই কাউকে একঘরে করার বিধান দিতে পারে আবার ইচ্ছে করলেই অপবাদ দূর করার জন্য নতুন বিধান দেয় অর্থাৎ অর্থকড়িই ওই সমাজে মহাশক্তিমান। যে ব্রাহ্মণকে অর্থকড়ি দেবার সামর্থ্য রাখে সমাজ ও শাস্ত্র তার পক্ষেই কথা বলে। ওই সমাজের পুরুষ রক্ষিতা পোষে, স্ত্রী স্বাস্থ্যবতী না হবার কারণে স্ত্রীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। স্ত্রী ও তার বিপন্ন বিধবা মাতা আদালতে নালিশ করলে হাকিম স্ত্রীকে খোরপোষ বাবদ আটটাকা দেবার হুকুম দেন। এত টাকা গচ্চ। দেবার ভয়ে স্বামীটি তখন স্ত্রীকে ঘরে তোলে কিন্তু বাড়ির রাখাল বাগদী ছোড়াকে স্ত্রীর পেছনে লেলিয়ে দেয়। বিপন্না স্ত্রীটি তখন মায়ের কাছে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। শোভনতা ও সুরুচিশীলতার পরিমণ্ডলে বর্ধিত বাবুদের কাছে ওই মানুষের সংকীর্ণতা, সামান্য পয়সার জন্য কলহ, খুন করার ইচ্ছা, দারিদ্র্য, শঠতা ও ইতরতা অসহ্যবোধ হয়। তারা দীর্ঘদিন গ্রামে বাস করার পরিকল্পনা নিয়ে গেলেও তিন দিনের মাথায় গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁদের দৃষ্টিতে গ্রামের যে রূপ ধরা পড়ে তা নারকীয় ও বীভৎস। তাদের চোখে দারিদ্র্য ও ক্লেদজর্জরিত পল্লীবাসীরা প্রতীয়মান হয় নরকের কীটরূপে। ওই সমাজকে মনে হয় নরক। ওই নরকের বীভৎস নারকীয় জীবন সহ্য করতে না পেরে তারা শহরে প্রায় পালিয়ে আসে। "রোমন্থন" উপন্যাসেও জগদীশ গুপ্ত প্রবলভাবে পল্লীসমাজের ইতরতার চিত্র রচনা করেছেন। মনে হয় তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে পল্লীসমাজকে ইতরতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। এই পল্লীসমাজ ও জীবন ঠিক বাস্তব পল্লী ও জীবন নয় বলেই মনে হয়। বরং মনে হয় যেন এই পল্লী জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট পল্লী, যেখানে অনৈতিকতা হানাহানিই জীবনপ্রবাহের সূত্র।

"তাতল সৈকতে" (১৩৩৮) উপন্যাসে আছে একটি দরিদ্র পরিবারের দুর্দশা দুঃখ সংগ্রামের এবং সমাজের ইতরতা ও অমানবিকতার পরিচয়। ওই সমাজ এতোই হিংস্র ও অমানবিক যে তা কেড়ে নেয় মানুষের মানসিক সুস্থিরতা, জীবন যাপনের স্বাভাবিকতা ও বেঁচে থাকার প্রেরণা। ওই সমাজ সংবেদনশীল মানুষকে আত্মহননে পর্যন্ত বাধ্য করে। এ উপন্যাসের পাত্রপাত্রী বিদুর, তার স্ত্রী শরৎ, পুত্র শান্ত, স্থানীয় ব্যবসায়ী মনোহর দত্ত, তার রক্ষিতা সুখী, রণজিৎ প্রমুখ। লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে ক্লেদ কদর্যতা ও নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ সমাজের উপস্থাপনা করেছেন। ওই সমাজ পাপ ও অনৈতিকতায় পূর্ণ। ওই পাপ ও অনৈতিকতা গোপন রাখার প্রয়োজনবোধ

করে না অর্থশালী মহাজন। ওই সমাজের ব্যবসায়ী মহাজন স্ত্রীর বাইরেও রক্ষিতা পোষে, যে কোনো নারীকে শয্যাসঙ্গিনী হবার প্রস্তাব দেয়। হিংস্র ও পাশবিক নীচতায় ভরা ওই সমাজ আর সামাজিক মানুষগুলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মনুষ্যত্বহীন, ইতর ও নিষ্ঠুর। ব্যবসায় মার খাওয়া পিতার নিঃসম্বল পুত্র বিদুর পিতার ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং প্রত্যেকেই তাকে নানা ছুতায় প্রত্যাখ্যান করে। বিদুর অবশেষে সামান্য কর্মচারীর কাজই গ্রহণ করে। অনন্যোপায় বিদুর স্বাধীন ব্যবসা করতে না পেরে 'অবশেষে কারবার সূত্রে একদিন তাহারা যাদের সমকক্ষ ছিল বিদুর তাহাদেরই একজনের অনুগ্রহ মানিয়া লইল-মনোহর দত্ত তাহাকে কর্মচারী করিয়া রাখিলেন।'[২৮] মনোহর দত্ত এতোই ইতর যে নিজের এই দয়ার কথা উচ্চকণ্ঠে অন্যদের জানাতে জানাতে বিদুরকে দিয়ে ভৃত্যের কাজগুলোও করিয়ে নেয়। বিদুরের আকস্মিক মৃত্যুতে স্ত্রী শরৎকে আরো বেশি অভাবের মুখোমুখি হতে হয়। আদালতের নীলামে একটি ঢেঁকি কিনে শরৎ, ধান ঢেঁকিতে ছেটে চাল করে এবং লাভে বিক্রি করে। দুখানি ঘরের একখানি ভাড়া দেয় হোটেলের ঝি চিত্তকে। হোটেলের তরিতরকারি ঘরে বসে কুটে দিয়েও কিছু পারিশ্রমিক পায় শরৎ। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র শান্তকে আঁকড়ে ধরে জীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে। শরৎ পুত্রের জন্য এক অন্ধকার রাতে পথে অপেক্ষা করার সময় পথিক মনোহর দত্ত মাতাল অবস্থায় তাকে শয্যাসঙ্গী হবার প্রস্তাব দেয়। অপমানিত শরৎ মনোহর দত্তকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে। আহত মনোহরের চেঁচামেচি-তে লোক জড়ো হয়, তবে আঘাত গুরুতর না হওয়ায় হৈ চৈ থেমে যায় কিন্তু লোকজন শরতের চরিত্র নিয়ে কানাঘুষা শুরু করে। এই ঘটনাটি শরৎ-এর জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দেয়। ভ্রষ্টা অপবাদ রটে তার নামে, গ্রাম ত্যাগ করে গিয়েও এই অপবাদ থেকে সে রেহাই পায় না। লোকনিন্দায় অতিষ্ট হয়ে সে আত্মহত্যা করে।

ভণ্ডামি-ইতরতা-লোভ-রিরংসা-ক্লেদ সর্বব্যাপী ওই সমাজে। মনোহর দত্তও সমাজের গণ্যমান্য একজন ব্যবসায়ী, বাহ্যিকভাবে সে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, 'তাঁহার শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে খুঁদিয়া লেখা রহিয়াছে- 'এয়সা দিন নেহি রহেগা', বাড়ীর সদর দরজার গণেশ মূর্তির নীচে খোঁদা আছে, 'যতো ধর্মোস্ততো জঁয়ঃ', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অসৎ ও দুশ্চরিত্র। বারোয়ারি পূজার তহবিল থেকে সে অর্থ আত্মসাৎ করে। অন্য কর্মকর্তার কাছে পূজা তহবিলের হিসেব দিতে গিয়ে 'জেরায় পড়িয়া' 'পেটে পরানে এক হইয়া যায়' কারণ 'কাজের খরচ অপেক্ষা সেবারকার

পূজায় তিনি বাজে খরচই দেখাইয়াছিলেন বেশী ...সেই হইতে তহবিল তাঁর হস্তচ্যুত হইয়াছে।'[২৯] মদ্য ও পতিতা দুইয়েই তার আসক্তি প্রবল। স্ত্রীকে না জানিয়ে রক্ষিতা পোষে, রক্ষিতার অগোচরে অন্য নারী ভোগ করে। পথে একাকী কোনো নারীকে পেলে সে প্রস্তাব দেয়, 'ছুটো দেখছি....... দরদস্তুর করতে হবে, না একদরে বিক্রয়?'[৩০] ওই 'ছুটো মাগী' গৃহস্থ বউ হতে পারে কিনা এমন প্রশ্ন মনে জাগে না। ওই সমাজের মানুষেরা বিবেকবোধহীন ও নির্লজ্জ। কপটতা ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ তাদের জীবন। তারা যে গ্লানিকর জীবন যাপন করে তা নিয়ে তাদের কোনো লজ্জা বা গ্লানি নেই, মিথ্যাচার ও পাপাচারের পরিপূর্ণ জীবনকেই তারা স্বাভাবিক জীবন বলে মনে করে। তাদের ভালোমন্দবোধও অস্বাভাবিক ও বিকৃত। গৃহস্থ বধূর হাতে মনোহর দত্তের প্রহৃত হবার সংবাদ সমাজের সবাই জেনে ফেললেও মনোহর দত্ত লজ্জিত হয় না। যেন এটি একটি সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার, যার জন্য লোকনিন্দা সহ্য করতে হবে না অর্থাৎ সে জানে সে পুরুষ বলে এবং ধনশালী বলে লোকনিন্দার যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হবে না। কিন্তু সে ভয় পায় তার স্ত্রীকে। এ-ঘটনা যাতে স্ত্রীর কানে না পৌঁছে তার জন্য সে যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেয়। ভৃত্য প্রহারের সংবাদ স্ত্রীকে জানায়নি জেনে মুনিব তার বেতন বাড়িয়ে দেয়। স্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে ভেবে সে রাত্রি যাপনের জন্যও বাড়িতে ফেরে না। অপরাধবোধের কারণে যে সে এমনটি করে তা নয়। খাণ্ডারণী স্ত্রীকে সে ভয় পায় বলে তার মুখোমুখি হতে চায় না। অর্থাৎ ওই সমাজের নারীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রীতি ভালোবাসা বিশ্বাস নেই। আছে উগ্র অবিশ্বাস সন্দেহ ও ঘৃণা। একারণেই মনোহর দত্তের রক্ষিতা 'বাবু দড়ি ছিঁড়েছে, এমন উড়ো খবর পাওয়া মাত্র ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শরৎকে শায়েস্তা করতে ছুটে যায়। নিজেকে উচ্চকণ্ঠে 'মনোহরের মেয়ে মানুষ' বলে জাহির করতে কুণ্ঠা লজ্জা কিছুই হয় না তার। কুৎসা রটাতে অত্যন্ত সিদ্ধ ওই সমাজের নারীরা। মনোহর দত্তকে শরতের প্রহার করার ঘটনাটিকে 'পুষ্পপল্লব'ময় কুৎসিত ব্যভিচারের কাহিনীতে পরিণত করে তারা। যেমন, '...মনোহর দত্ত মদ খাইয়া উহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, ...কিন্তু আমাকে নয়, তোমাকে নয়, বিদুকে নয়, সিদুকে নয়, উহাকেই কেন সে...। ... কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহাই বা কে জানে। মানুষের অন্তরের গুপ্ত কথার সন্ধান কে রাখে বলো। ... এতবড় ঘটনার সমুদায়টা কি মাত্র ঐটুকু। ... ইহা যে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহার নিজের মন নিষ্কলুষ, তাহাই কি সে বুকে হাত দিয়া মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

অকুতোভয়ে বলিতে পারে। ... ঢের দেখা গেছে, কিন্তু কোথাকার জল কোথায় যাইয়া দাঁড়ায়, জল দাঁড়াইবার আগে তাহা বিধাতাও জানেন না। ... অমন সব মানুষ মানুষের চোখে ধূলা আর বিধাতার উপর টেক্কা দিতে এমন দক্ষ যে ডাল নড়ে ত পাতা নড়ে না। ... এমনি ওরা ধূর্ত। কিন্তু একদিন তার শেষ হইবেই ... মানুষের চোখে ধরা দিতে হইবেই।'[৩১]

গ্লানিজর্জরিত বিমর্ষ শরৎ লোকনিন্দা সইতে না পেরে একদিন রাতের অন্ধকারে পুত্রকে নিয়ে গৃহত্যাগ করে। পথে তার সঙ্গে দেখা হয় গুরুগৃহ পলাতক সদ্যতরুণ রণজিৎ-এর সঙ্গে। রণজিৎ তাকে মাতৃব্য সম্মান করে এবং স্বগ্রামের পৈত্রিক ভিটায় নিয়ে যায়। ওই সমাজও শরৎ-এর সমাজের মতোই ইতরতাপূর্ণ, মনুষ্যত্বহীন ও নোংরা। শরতের সমাজ মনে করে নতুন খদ্দের ধরার জন্যই শরৎ গৃহত্যাগিনী হয়েছে। মনোহরের সঙ্গে দরে দামে বনেনি বলেই মনোহর দত্তের সঙ্গে শরতের অবৈধ সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় বলে মনে করে ওই সমাজ। আর রণজিতের গ্রামের মনুষ্যত্বহীন ইতর মানুষেরা সন্দেহ বিষে জর্জরিত করে রণজিৎ ও শরৎকে। রণজিৎ ও শরতের সম্পর্ক নিয়ে অপকৌতূহল তাদের মধ্যে উগ্র হয়ে ওঠে। রণজিৎ ও শরতের মাতাপুত্রের সম্পর্ক তারা স্বীকার করে না বরং গ্রামের লোকের মনে হতে তাকে, 'কেবল চুপ করিয়া থাকিয়া, কি একটা অতিশয় চমৎকার আর গুরুতর কথা চাপিয়া রাখিয়া গ্রামস্থ স্ত্রী-পুরুষকে ও ঠকাইয়া যাইতেছে ... অনুমান করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না ... ব্যাপার আঠারো আনা ঘোরালো করিয়া তোলা যাইতেছে না ....... প্রাণ পাগল পাগল ঠেকিতেছে ... যেন সেই কথাটা শুনিয়া আঁৎকাইয়া না ওঠা পর্যন্ত দেহের শান্তি নাই, মনের বিশ্রাম নাই।'[৩২] যখন তখন রণজিতের কুশল সংবাদ নেয়ার জন্য গ্রামের পুরুষেরা তার বাড়ির দরোজায় উঁকি দিতে থাকে, নারী বাহিনী আসল খবর বের করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। রণজিৎ সদগোপকন্যা শরতের হাতে খাচ্ছে জেনে গ্রামের পঞ্চায়েত রণজিৎকে একঘরে করে দেয়। অর্থাৎ কিছুতেই ওই সমাজ বিশ্বাস করতে পারে না যে শরৎ ও রণজিতের মধ্যেকার সুন্দর পবিত্র ও মধুর মাতা ও পুত্রের সম্পর্কটি। ইতরতা ও অবৈধ সম্পর্কই জগতে একমাত্র সত্য বলে গণ্য করে জগদীশ গুপ্তের পল্লীসমাজ। মিথ্যা অপবাদ ও লোকনিন্দা সহ্য করতে না পেরে শরৎ আত্মহত্যা করে। অশ্রুকুমার সিকদারের মতে 'জয় হলো সর্বব্যাপী ইতরতার।'[৩৩] এ-উপন্যাসেও সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে দারিদ্র্য, লাম্পট্য, নির্লজ্জতা, অপবাদ রটনার আগ্রহ ইত্যাদি। ইতরতার অতিশায়িতরূপ পাওয়া যায় তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের

মতো এ-উপন্যাসেও।

জগদীশ গুপ্ত পল্লীকে কোনো রকম মোহগ্রস্ত দৃষ্টিতে দেখেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিলো পল্লীর ও পল্লীর মানুষের কদর্যতা ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা। তিনি পল্লীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির জীবনকথা উপস্থাপিত করেন। ওই জীবনের কদর্যতা ও ইতরতা নির্দেশই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মধ্যে কোনো সহানুভূতি নেই, মমতা নেই, বরং এক ধরনের প্রতিক্রিয়া রয়েছে। পল্লীর যে নারকীয় চিত্র তিনি রচনা করেছেন তাকে নিরপেক্ষ চিত্রণ বলে মনে করতে দ্বিধা জাগে, কারণ তিনি পল্লী ও তার অধিবাসীদের মধ্যে ভালো কিছু দেখেন নি। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রথাগত পল্লীবিমুগ্ধতার প্রতিক্রিয়া রূপে গণ্য করা যায়। তিনি যেন পণ করেছিলেন যে তিনি দেখিয়ে দেবেন পল্লী কতো অসুন্দর, তার মানুষেরা কতোটা অমানুষ। তাই তাঁর পল্লীচিত্রও বাস্তবতার বিশ্বস্ত উপস্থাপন নয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার রাঢ় ভূখণ্ডের পল্লীর জীবনের অবিকল উপস্থাপক; তাঁকে ওই অঞ্চলের জীবনের বিশ্বস্ত দলিল রচয়িতাও বলা যায়। তারাশঙ্করের পল্লী-প্রকৃতি-মানুষ চিরকালের পল্লী-প্রকৃতি ও মানুষ নয়। তা বিশেষকালে ও স্থানে স্থাপিত। আধুনিক বাঙলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপন-রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ; তিনি পল্লী সম্পর্কে কোনো পূর্বধারণা নিয়ে পল্লীজীবন উপস্থাপন করেন নি। তাঁর পল্লী ওই সময়ের রাজনীতিক-সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আলোড়িত। তারাশঙ্করের উপন্যাসে পল্লীর সবশ্রেণীর মানুষ স্থান পায়। তারাশঙ্করের জমিদার মানেই হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু, আর্থনীতিক ভাবে দুর্গত, প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন; তাদের মধ্যে একদল প্রাচীন, তারা দুশ্চরিত্র নারীলিপ্সু ও অত্যাচারী এবং আরেক দল নবীন, তারা আদর্শবাদী, সমাজ-সংস্কারক, উদার মানবতা-বাদী। শেষ পর্যন্ত তারা কোনো না কোনো রাজনীতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত হয়। তারাশঙ্করের সাধারণ গৃহস্থেরা মোটামুটি সচ্ছল। যদিও নানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় তাদের জীবন নানা সময়ে জর্জরিত হয়। তারাশঙ্করের পল্লীভিত্তিক উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা ব্যাপকভাবে উপস্থিত থাকে। তাদের মধ্যে রয়েছে বাগদী, ডোম, বাউরী, সাঁওতাল, সদগোপ চাষী প্রভৃতি। তাদের জীবনের রূপ এতো ব্যাপক ও বিশ্বস্তভাবে আর কারো উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় নি। বাঙলাদেশে পল্লী মানেই হচ্ছে দারিদ্র্য এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস ওই দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের উপস্থাপন। ওই পল্লীজীবনের জমিদার ও মহাজনের শোষণ আছে, দুর্ভিক্ষ

খরা অতিবৃষ্টি ঝড় অগ্নিকাণ্ড, কলেরা-বসন্ত, তীব্র জলাভাব ও অনপণেয় দুর্দশা আছে এবং ঋতুতে ঋতুতে নানা সামাজিক উৎসবও আছে। বিভূতিভূষণের উপন্যাস পাঠের পর পল্লীজীবন সম্পর্কে মোহ জাগে। বিভূতিভূষণের পল্লীজীবন আমাদের আবেগগ্রস্ত করে তোলে। তারাশঙ্করের পল্লী-প্রকৃতির রূঢ়তা ও পল্লীজীবনের অবিরাম সংগ্রামশীলতা ওই জীবন যাপনের জন্য মোহগ্রস্ত করে না, কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার অবিরাম সংগ্রাম জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তারাশঙ্করের পল্লীজীবন স্থির অপরিবর্তনীয় নয়, বরং তা সময়ের চাপে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনকে শুভ বলেই তিনি গণ্য করেছেন।

তারাশঙ্করের "নীলকণ্ঠ" (১৩৪০) একটি সাধারণ পল্লীপরিবারের ধ্বংসের কাহিনী। কাহিনীতে রয়েছে দারিদ্র্য, অনৈতিকতা, ব্যভিচার, দুর্যোগ ও বাৎসল্য। তবে "নীলকণ্ঠ" উপন্যাসে পারিবারিক জীবন বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজবাস্তবতার পরিচয়ও লিপিবদ্ধ। শ্রীমন্ত ও গিরির দাম্পত্যজীবনে অন্ন ও অর্থকষ্ট তেমন না থাকলেও সঙ্কট আসে গিরির আপাতবন্ধ্যাত্বের জন্যে। তাদের অপার স্নেহে লালিত গৌরীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠার আশঙ্কায়, তারা দুজনে গৌরীকে গঞ্জিকাসক্ত পিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সকল ভূসম্পত্তি বন্ধক দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলে। অন্ধ অথর্বের সঙ্গে গৌরীকে নির্দ্বিধায় তুলে দিতে দেখে হরলালের মাথা ফাটিয়ে শ্রীমন্ত মামলায় জড়িয়ে পড়ে। কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে কারাবাস বরণ করতে হয়। ধনী ভূস্বামীর লালসার শিকার হয়ে গিরি শুরু করে অবৈধ সম্পর্কের জীবন। সন্তানসম্ভবা হয়ে সে পথে নামে; তাকে দেহ ব্যবসা করেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। যৌনব্যাধি আক্রান্ত হয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে গিরির। শ্রীমন্ত ছাড়া পেয়ে গ্রহণ করে বৈষ্ণব ভিখারীর জীবন। গিরির অবৈধ পুত্র নীলকণ্ঠের পরিচয় না জানলেও তাকে আশ্রয় দেয় শ্রীমন্ত। একটি পরিবারের চরম বিনাশের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে, যে-বিনাশের মূলে রয়েছে বাৎসল্য। লালিত কন্যার জীবনকে সুখ-শান্তিময় করে তোলার ব্যাকুলতার কারণেই শ্রীমন্ত-গিরির শান্ত সচ্ছল জীবন দারিদ্র্য লাঞ্ছনা ও গ্লানিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে; দুটি মানুষের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে, ধ্বংস করে। বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে কাহিনীর পরিবেশের বিস্তৃত বর্ণনা দেন এবং বাস্তবতাকে করে তোলেন মধুর ও প্রশান্ত। তারাশঙ্কর পরিবেশের বর্ণনা করেন সংক্ষেপে; বিস্তৃত বিবরণ রচনা করে বলেন না, কিন্তু কাহিনীকে এমনভাবে বর্ণনা করেন যাতে তাঁর পটভূমি-বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিনি ঘটনার পর ঘটনা পরম্পরায় দেখান ওই সমাজ কিংবা বাস্তব পটভূমির কঠোরতা। বাস্তবতার উপস্থাপনকারী হিসেবে তারাশঙ্কর নিরাসক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। বাস্তবজীবনের প্রেক্ষাপটে মনের আকুলতা কিংবা কোনো আদর্শের কিংবা মানবজীবনের নানা আবেগের উথানপতন-বিকাশ দেখানো তারাশঙ্করের একটি প্রধান প্রবণতা। এ-উপন্যাসেও তাই ঘটেছে। সন্তানকামনায় অধীর স্বামী-স্ত্রীর মনস্তাপ-আশা-স্নেহ-কাতরতাপূর্ণ জীবন চিত্রিত করার সঙ্গে বাস্তবজীবন সমস্যার ব্যাপক পরিচয় উপস্থাপন করেছেন তারাশঙ্কর।

যে সমাজে শ্রীমন্ত ও গিরি বাস করে তা ক্রূর, অভিসন্ধিপরায়ণ, অসৎ, প্রতারক, লোভী ও দুশ্চরিত্র। মহাজনের কাছে জমি বিক্রী করতে গেলে ন্যায্যদামে অল্প ভূখণ্ড কেনার চেয়ে মহাজন সমস্ত ভূসম্পদ বন্ধক রাখায়ই আগ্রহবোধ করে। কারণ তাতে 'সুদের তন্তু বয়ন করিয়া একদিন' 'সমগ্র জমিটুকু টানিয়া লইতে পারিবে।'[৩৪] পিতা এ-উপন্যাসে পশুমাত্র। এ-সমাজ নৈতিকতার বিধিবিধান মেনে চলে তা এক ধরনের ভণ্ডামী। একটি পারিবারিক জীবনের বিপর্যয় বর্ণনা করতে গিয়ে তারাশঙ্কর উপস্থাপন করেছেন একটি নষ্ট সমাজকে, যে-সমাজ পীড়ন করে ব্যক্তিকে, নষ্ট করে দরিদ্র জীবনের সহজসুখ, বিপন্ন করে অসহায় নারীর গার্হস্থ্য জীবন, ওই সমাজ ধনীর সকল অন্যায় না দেখার ভান করে চলে। একটি ভোজ পেয়েই নিশ্চুপ হয়ে যায় সমাজের মুখ। অসহায় বিপন্নকে সাহায্য শুশ্রূষা করার মানবিক বৃত্তি সেখানে নেই। নারী হচ্ছে খাদ্যমাত্র-এই বোধ থেকে গিরিকে ব্যবহার করেছে সমাজের সকল স্তরের মানুষ। রূঢ় পাশবিকতাপূর্ণ, ভণ্ড, ক্রূর অমানবিক পল্লী সমাজ বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে এখানে।

"প্রেম ও প্রয়োজন" -এর (১৩৪২) কাহিনী গড়ে উঠেছে বীরভূমের জমিদারশাসিত একটি গ্রামের প্রেক্ষাপটে। যদিও কাহিনীর কাল নির্দেশিত হয় নি, তবুও নায়ক সঞ্জীবের পল্লীসংস্কার, নারীপুরুষের সমানাধিকার-বিষয়ক তর্ক, খদ্দর প্রীতি ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায় বিংশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের সময়-প্রেক্ষাপটটি এ-উপন্যাসে নেয়া হয়েছে। সঞ্জীব চরিত্রের মধ্যে তারাশঙ্করের জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এ-উপন্যাসে পাওয়া যায় দুশ্চরিত্র জমিদার জীবনের ছবি। স্বেচ্ছাচারী জমিদারের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ও ক্রূরতায় পল্লীবাসীর জীবন কীভাবে বিপন্ন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তার চিত্র পাওয়া যায় "প্রেম ও প্রয়োজন"-এ। পত্নীবিয়োগের পর জমিদারের শিশুপুত্রের পরিচর্যাকারী হিসেবে আনা হয় একরে পর এক

নারী, যাদের ওই জমিদার রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করে। পতিতাকন্যা খ্রিস্টান ডাক্তার নির্মলা জমিদারের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসকের দায়িত্ব নিয়ে এসে জমিদারের রক্ষিতা হয়ে পড়ে। নির্মলায় অরুচি ধরে গেলে, নিম্নবর্ণের দরিদ্র কন্যা বিধবা রমাকে পুত্রের জন্য কিনে নেয় জমিদার। রমার পিতা রমনদাস সচ্ছলতা ও অর্থকড়ির লোভে কন্যাকে জমিদারের রক্ষিতা হবার জন্য বিক্রী করতে গ্লানি বোধ করে না। এ উপন্যাসে জমিদারের লোভ, দম্ভ, ক্রূরতা, বহুনারীসম্ভোগ পঙ্কিল জমিদার জীবনের উপস্থাপনার পাশে লেখক একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠারও প্রয়াস পেয়েছেন। আদর্শবান সর্বসংস্কারমুক্ত পল্লীসেবক সঞ্জীব। সে খদ্দের পরে, জমিদারের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, অন্ত্যজ গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্য নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, সমবায় দোকান প্রতিষ্ঠা করে নিম্নশ্রেণীকে উন্নত সুন্দর জীবনের আস্বাদ দিতে চায়। মানুষকে সে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে; জমিদারের রক্ষিতা জেনেও চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত নির্মলার প্রতি শ্রদ্ধা হারায় না সে। গ্লানি–জর্জরিত নির্মলাকে তাই সে বলে, 'কিসের লজ্জা আপনার? কার চেয়ে ছোট আপনি? দয়া মায়া মহত্ত্ব সত্যনিষ্ঠায় আপনি তো কারও চেয়ে ছোট নন।'[৩৫] নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী সে 'কমরেড' বলে সম্বোধনে আগ্রহী, নারীকে সে শুধু সম্ভোগের বস্তু কিংবা দুর্বল অবলারূপে দেখে না; দেখে কর্মসহচরীরূপে। যেমন, সে বলে– 'আমরা কমরেড মিস গাঙ্গুলী। আপনি আমার চেয়ে হীন নন, আমার চেয়ে অস্পৃশ্য নন, পৃথিবীর সমতল বুকের উপর আমরা মানুষ।'[৩৬] এ–উপন্যাসে শেষে জয় হয় গান্ধীবাদের; মনে হয় গান্ধীবাদকে আকর্ষণীয় করার জন্যেই চিত্রিত হয়েছে পল্লীজীবনের নারকীয় বাস্তবতার চিত্র।

প্রমথনাথ বিশী "ধাত্রীদেবতা" (১৩৪৬) সম্পর্কে বলেন যে এটি একটি আদর্শবাদী উপন্যাস।[৩৭] গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতিষ্ঠা কয়েকটি উপন্যাসে তারাশঙ্করের লক্ষ্য। বিশীর অভিমত এমন : 'ধাত্রীদেবতা একটি আদর্শানুসারী উপন্যাস। গণদেবতাও তাই। কিন্তু এগুলি তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত বলে মনে হয় না। আদর্শবাদ ও রিয়ালিজম দুই শ্রেণীর রচনাই তারাশঙ্করের আছে, আদর্শবাদী উপন্যাসগুলি হয়তো অধিকতর জনপ্রিয় তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় সেই সব উপন্যাসে যথা 'কবি' এবং 'হাঁসুলি' বাঁকের উপকথা', যেখানে রিয়ালিজম প্রাধান্য পেয়েছে।'[৩৮] উদ্দেশ্যপ্রধান উপন্যাসে কাহিনী ও সমস্ত কিছু বিবৃত হয় ওই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে। "ধাত্রীদেবতা"য়ও তাই হয়েছে। "ধাত্রীদেবতা"

আদর্শবাদী যুবকরূপে শিবনাথের বিকশিত হয়ে ওঠার আখ্যান। তবে যে বাস্তবতার মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠেছে সে তার বিবরণ রয়েছে এতে। সমাজজীবনের ভগ্নদশা, জাতির অধঃপতন তাকে দুঃখিত করে; দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সে রাজনীতিপ্রবণ হয়ে ওঠে। শিবনাথ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পুত্র; তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সামন্তধর্মী। তার পিসীমা সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ; আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উদার মানবতাবাদী হচ্ছে শিবনাথের মা জ্যোতির্ময়ী। লোকহিত ব্রতে, দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে চায় সে পুত্রকে; জমিদারী দর্প, ভোগবিলাস উচ্ছৃঙ্খল অশিক্ষাপূর্ণ জীবনধারা থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিবেকবান মহৎ মানুষে পরিণত হোক সন্তান তাই জননীর কাম্য। এ নিয়ে ননদ ও ভ্রাতৃবধুর মধ্যে বিরোধ বাধে। পুত্রের শিক্ষার কথা ভেবে ননদ ভ্রাতৃবধূর ইচ্ছেই মেনে নেয়, তবে অল্প বয়সে শিবনাথের বিয়ে দিয়ে ঘরে একটি ছোট বউ নিয়ে সংসার করার শৈলজাদেবীর সাধ পূর্ণ করায় বাধা দেয় না জ্যোতির্ময়ী। তবে এ বিবাহ সুখকর হয় নি। শিবনাথের গ্রামে মহামারীরূপে কলেরা দেখা দেয়, দেখা দেয় খাদ্য অনটন। শিবনাথ কলকাতা থেকে আসা মেডিক্যাল ভলেনটিয়ারদের সঙ্গে রোগীদের শুশ্রূষা করে চলে; চাল ভিক্ষা করার জন্য দল গঠন করে দ্বারে দ্বারে চাল ভিক্ষা করতে থাকে অনাহারী দরিদ্রদের জন্য। কলেরা-আক্রান্ত একটি বিধবা ডোমবধূকে সেবা করে সে বাঁচায়; তবে এতে তার নামে গ্রামবাসীরা কুৎসিত অপবাদ রটায়। কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে শিবনাথ জড়িয়ে পড়ে তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে। হত্যা ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই ব্রিটিশদের হটানো সম্ভব এ তত্ত্বে আস্থাশীল হয়ে পড়ে সে। সে লক্ষ করে আনার্কিষ্ট ও টেরোরিস্টদের উগ্র চরমপন্থী কার্যকলাপ; তার মন এতে সায় দিতে পারে না। গ্রামে ফিরে আসে শিবনাথ। জননীর মৃত্যুশোক সামলাতে না সামলাতে আসে আরেক বিচ্ছেদ বেদনা। মায়ের মৃত্যুর পর গৌরী নিজে থেকে সংসারে এসে পৌছুলে তাকে গৃহে অধিষ্ঠিত করে শৈলজাদেবী কাশীবাসিনী হন। কারণ পিসীমাকে গৌরী সহ্য করতে পারে না। শিবনাথের দারিদ্র্য, ভূনির্ভরশীলতা ইত্যাদি গৌরীকে ক্ষিপ্ত করে। সে স্বামীকে চাকুরী নেয়ার জন্য চাপ দেয়, ব্যবসা করে টাকা উপার্জন করতে বলে।

খাজনা বকেয়া থাকার দরুণ শিবনাথের জমিদারী নিলামে যাবার উপক্রম হলে প্রজারা এসে কেঁদে পড়ে। কারণ তারা জমিদারী চায় কিন্তু নতুন জমিদার চায় না। নায়েব রাখাল সিং পাইক কেষ্ট সিং খাজনা

আদায়ের জন্য মহালে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু খরার দরুণ ফসল উৎপাদনে অসমর্থ প্রজারা কিছুতেই সামান্য পয়সাও দিতে পারে না। শিবনাথ নিজে খাজনা আদায়ে বেরিয়েও ব্যর্থ হয়। অবশেষে তার শিক্ষক রামরতনবাবু নিজের সম্পত্তি বন্ধক রেখে মহাজনদের কাছ থেকে খাজনার টাকা এনে দেয়। এর মধ্যে আড়াই বৎসর কেটে যায়। আসে ১৯২১ সাল। শিবু ময়ূরাক্ষীর চরে একটি খামার বাড়ি তৈরি করে, জমিদারী দেখাশোনার ভার নায়েবের ওপর ছেড়ে দিয়ে সে ওই অঞ্চলের শুদ্রদের মধ্যে মুক্তির বাণী প্রচার করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। তাদের নাইট স্কুলে শিক্ষাদান, চিকিৎসাবিধি ও স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে পরিচিত করানো, চরকা ও তাঁত প্রবর্তন করে নিজেদের বস্ত্র নিজেরা তৈরি করে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার ব্যবস্থা নেয়। এক সন্ধ্যায় তার কাছে আসে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো টেরোরিস্ট সুশীল। সে জানায় তাদের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, এখন সে দেশের বাইরে চলে যেতে চায়, বাইরে থেকে দেশকে সেবা করার জন্য। সুশীল চলে গেলে শিবনাথ গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক রূপে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। নিজগ্রামে ফিরে এসে জনগণের কাছে স্বরাজের বাণী প্রচার করতে থাকে। সে বুঝতে পারে জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে দেশ স্বাধীন হবে না। গ্রামে গান্ধীবাদী আদর্শ প্রচারের সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সংবাদ পেয়ে পিসীমা কাশী থেকে এবং সন্তানসহ গৌরী কলকাতা থেকে আসে। পিসীমার কাছে আত্মসমর্পণ করে গৌরী। দুজনে শিবনাথকে দেখতে যায় কারাগারে। পিসীমা আশীর্বাদ করে এবং গৌরী সমর্থন করে তার এই বিপ্লবী ভূমিকা। পিসীমাকে ধাত্রীদেবতা জেনে প্রণাম করে শিবু এবং নিজের সন্তানের লালন-পালনের ভার তার ওপর অর্পণ করে।

"ধাত্রীদেবতা" উপন্যাসে বীরভূমের একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারকে কেন্দ্র করে ওই সমাজের সামাজিক অবস্থার এবং কিছু পরিমাণে রাজনীতিক অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর পটভূমিকে অবিকল উপস্থাপন করতে চেয়েছেন কিন্তু একটি বিশেষ আদর্শবাদ প্রচার এ-উপন্যাসে তাঁর লক্ষ্য। তিনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের জীবন পদ্ধতি যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি তাদের সামন্তধর্মী আচরণ ও বিশ্বাস উপস্থাপিত করেছেন এবং ওই পরিবারে নতুন রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ দেখিয়েছেন। যেহেতু এ-উপন্যাসের বিষয় পল্লী এবং পল্লীর সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে দারিদ্র্য, তাই এ-উপন্যাসে পল্লীর সাধারণ মানুষের দুর্দশার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারাশঙ্করের পল্লী ছায়া সুনিবিড় সুখ-দুঃখে ভরা

শান্তির নীড় নয় বরং তা মানুষের জীবন যাত্রার সংগ্রামে জীবন্ত। তারাশঙ্কর উপন্যাসে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার যেমন বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি সেখানকার মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতিরও অবিকল বর্ণনা দিয়েছেন। উপন্যাসটিতে দু'ধরনের রাজনীতির পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। এক ধরনের রাজনীতি সন্ত্রাসবাদী, অন্য ধরনের রাজনীতি গান্ধীবাদী, যে আদর্শে তারাশঙ্কর নিজে বিশ্বাস করেন। "ধাত্রী দেবতা"য় শিবনাথ গান্ধীবাদী আদর্শ গ্রহণ করে কারাবরণ করে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর ওই অঞ্চলকেই গান্ধীবাদী আদর্শে দীক্ষিত করেছেন। তাই এ-উপন্যাস পল্লী বাস্তবতার বিশ্বস্ত বর্ণনা হয়েও তা আদর্শের রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

"কালিন্দী" (১৩৪৭) নদীতে বিশার চর জেগে উঠলে তা দখল করার জন্য নিকটবর্তী গ্রামের বিভিন্ন শরিকের জমিদারেরা তৎপর হয়। এই জমিদারদের মধ্যে সম্প্রীতি কিংবা ঐক্য ছিলো না, তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে, একে অন্যের অগোচরে কুৎসা রটায়। ওই চরের ওপর অন্যান্য শরিকদের তুলনায় শক্তিশালী জমিদার ইন্দ্র রায়ের সহায়তায় জমিদার রামেশ্বর চক্রবর্তীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। চর জাগবার খবর পেয়ে যাযাবর সাঁওতালেরা ওই চরে এসে বসতি স্থাপন করে, আগাছা জঙ্গল পরিষ্কার করে ফসলের চাষ করে। নিকটবর্তী গ্রামগুলোর সদগোপ প্রজারাও চরে জমি বন্দোবস্ত নেয়; তবে তারা এতোই অসৎ যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের সেলামী না দেয়ার চক্রান্তও করে। জমিদারদের কাছ থেকে কিছু জমির বন্দোবস্ত নেয় নব্যধনিক বিমলবাবু। বিস্তীর্ণ এলাকায় আখচাষ করে সে এবং জমিদারের অনুমতি না নিয়ে চরে চিনির কারখানা স্থাপন করে। জমিদারের সঙ্গে এ নিয়ে সংঘর্ষ বাধে; ওই বণিক কূটকৌশল শঠতা অর্থকড়ির জোরে চরের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়ে নেয়। বন্য সাঁওতালদের অধিকাংশ পরিণত হয় শ্রমিকে, যারা শ্রমিক হতে রাজি হয় না চর থেকে তাদের উৎখাত করা হয়। এভাবে শস্যশালী একটি সবুজ চর পরিণত হয় কুৎসিত বস্তিভরা কারখানা এলাকায়।

"কালিন্দী" হচ্ছে চর দখলের উপন্যাস-পল্লীর বিভিন্ন স্তরের মানুষ চরটি দখল করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে আছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, ভ্রাম্যমাণ সাঁওতাল, অবস্থাপন্ন সদগোপ চাষী, জমিদারের নায়েব, সদ্যধনিক ব্যবসায়ী প্রমুখ। ওই চরের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা করে চলে এরা প্রত্যেকে, কূটকৌশল প্রয়োগ করে, জাল দলিলপত্র তৈরি করে। একটি চরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের পল্লীর মানুষের সম্পত্তি অধিকারের লোভ ও পাশবিকতার বিবরণ লিপিবদ্ধ

হয়েছে উপন্যাসটিতে। তারাশঙ্কর এ-উপন্যাসেও ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের প্রতি সহানুভূতিশীল, তিনি জমিদারদের ক্ষয়িষ্ণুতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন সমকালীন শক্তির লড়াই-এ সামন্ত শ্রেণীর পরাজয় অনিবার্য। সেখানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে নব্যধনিক শ্রেণী। এ-উপন্যাসেও একটি আদর্শবাদী তরুণ রয়েছে এবং যে উঠে এসেছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী থেকে। "ধাত্রীদেবতা''য় ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী থেকে উঠে এসেছিলো গান্ধীবাদী নায়ক এবং ''কালিন্দী"তে একই শ্রেণী থেকে উঠে এসেছে নায়ক অহীন্দ্র, যে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদকেই দরিদ্র সাধারণের দুঃখ মোচনের একমাত্র উপায় রূপে মনে করে। এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে এক পরিবর্তনমুখী পল্লীসমাজ ও জীবনের রূপ।

"গণদেবতা" (১৩৪৯) উপন্যাসটির নাম তারাশঙ্কর রাখতে চেয়েছিলেন "চণ্ডীমণ্ডপ", এবং এটিই এ-উপন্যাসের যথার্থ নাম হতে পারতো। চণ্ডীমণ্ডপকেন্দ্রিক একটি পল্লীর জীবনের রূপ উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিতে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। তেরোশো ঊনত্রিশ বঙ্গাব্দের রাঢ় অঞ্চলের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী পল্লীর সামাজিক, আর্থনীতিক, ব্যক্তিগত, ধর্মীয় জীবনের রূপ এতে পাওয়া যায়। এ-উপন্যাসে সমাজের তিন শ্রেণীর মানুষের জীবনের রূপ পাওয়া যায়। শিবকালীপুরের এক অংশে বাস করে অন্ত্যজ, বাগদী শ্রেণীটি। ওই অন্ত্যজদের জীবন চরম দুর্দশায় পরিপূর্ণ। তাদের লড়তে হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে; বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়ের সঙ্গে। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ওই জীবনকে বিধ্বস্ত করে বারে বারে, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা ওই শ্রেণীর মানুষদের বাধ্য করে হীন অনৈতিক জীবনযাপনে। এছাড়া রয়েছে উচ্চবর্ণের সম্পন্ন গৃহস্থদের শোষণ। সব মিলিয়ে তারা যাপন করে পশু-মানুষের জীবন। ওই সমাজের মেয়েরাও রসাতলের পশু-মানুষের জীবন যাপন করে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে বাসন মাজে, দুধ ও ঘুঁটে বিক্রি করে এবং দেহ বিক্রী করে। স্বামীর প্রহার তাদের জীবনে স্বাভাবিক ব্যাপার, ননদ শ্বাশুড়ী প্রতিবেশী ও স্বামীর সঙ্গে কলহবিবাদ বিসম্বাদ করা ওই নারীদের প্রাত্যহিক কাজ। তাদের 'জীর্ণ ঘর রিক্ত অঙ্গনে' বারেবারে হানা দেয় ম্যালেরিয়া, ঘরে ঘরে শীর্ণকায় অর্ধউলঙ্গ অর্ধভুক্ত শিশুর দল। প্রতি গ্রীষ্মে তীব্র জলকষ্টের পাশাপাশি তাদের সহ্য করতে হয় মহামারী রূপে দেখা দেয়া কলেরার আক্রমণ। ওই শ্রেণীর পুরুষেরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কেউ কর্মকার, কেউ ছুতার এবং অধিকাংশই ভূমিহীন শ্রমিক। এদের কাজ হচ্ছে গ্রামের উচ্চ বর্ণের মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল গৃহস্থদের সেবা করা।

গ্রামের উচ্চবর্ণ শ্রেণীটির পূর্ব পুরুষেরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে এই অন্ত্যজ শ্রেণীটিকে গ্রামে এনে পত্তনি দেয়। প্রাচীনকাল থেকেই তাদের মজুরি হিসেবে বরাদ্দ করা হয় বিভিন্ন পরিমাণের ধান। কর্মকারের জন্য বরাদ্দ হয় মাল পিছু পাঁচ শালি আর ছুতারের জন্য বরাদ্দ হয় হাল পিছু চার শালি ধান। কিন্তু উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ওই শ্রমজীবীদের প্রাপ্য কখনোই ঠিকমতো মিটিয়ে দেয় না, কিছুদিন পরে দেয়া হবে কিংবা আসছে বছর দেয়া হবে বলে তারা প্রাপ্য মজুরি বাকি রেখেই কাজ করিয়ে নেয়। ওই শ্রেণীর ভূমিশ্রমিকদের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। উচ্চ-সম্প্রদায়টি তাদের মজুরি দেবার এমন ব্যবস্থা করে :

> এ পাড়ায় প্রায় সকলেই চাষীদের অধীনে খাটে-বাঁধা বাৎসরিক, বেতন বা মাসে ভাতের হিসাব মত ধান লইয়া থাকে এবং ছোটগুলা পেটভাতায় বৎসরে চারখান সাত হাত কাপড় লইয়া রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা মাসে আট আনা হইতে একটাকা পর্যন্ত মাহিনা পায়-ধানের পরিমাণও তাহাদের বেশী। পূর্ণ জোয়ানদের অধিকাংশই উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে চাষে শ্রমিকের কাজ করে। মনিব সমস্ত চাষের সময়টা ধান দিয়া ইহাদের সংসারের সংস্থান করিয়া দেয়-ফসল উঠিলে ভাগের সময় সুদ-সমেত ধান কাটিয়া লয়। সুদের হার প্রায় শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত। অজন্মার বৎসরের এই ঋণ শোধ না হইলে আসল এবং সুদ এক করিয়ে তাহার উপর আবার ঐ হারে সুদ টানা হয়। এই প্রথার মধ্যে অন্যায় কিছু ইহারা বোধ করে না- বরং সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের ভাবই অন্তরে ইহার জন্য পোষন করে। দায় দৈবে মনিবেরা যে সাহায্য করেন—সেইটাই অতিরিক্ত করুণা।[৩৯]

ওই সমাজে নৈতিকতাবোধ শিথিল। উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে ওই সমাজের নারীদের অবৈধ সম্পর্ক একটি সাধারণ ব্যাপার। ওই শ্রেণীর জীবনে ক্ষুধা এতো প্রকট, অনটন এতো তীব্র যে নারীদের পতিতাবৃত্তিকে ওই সমাজের পুরুষেরা দুটো পয়সা আয়ের উপায় বলে গণ্য করে। এমন কী জননী নিজে কন্যাকে পতিতা হতে উৎসাহিত করে। স্বামী-স্ত্রীকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে নিঃশব্দে অনুমোদন দেয়। নারীদের অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন কিংবা বহুপুরুষে গমনের ব্যাপারে ওই সমাজের পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গী এমন: 'এই স্বভাব দমনের জন্য কোন কঠোর শাস্তি বা পরিবর্তনের জন্য কোন আদর্শের সংস্কার ইহাদের সমাজে নাই। অল্পস্বল্প উচ্ছৃঙ্খলতা স্বামীরা পর্যন্ত দেখিয়াও দেখে না। বিশেষ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যদি উচ্চবর্ণের সচ্ছল অবস্থার পুরুষ জড়িত থাকে তাহা হইলে তো তাহারা

বোবা হইয়া যায়।'[৪০] প্রয়োজন বা ক্ষুধার কাছে গৌণ হয়ে গেছে অপরাধ বা পাপবোধ। ক্ষুধা ওই জীবনে চরম সত্য এবং যে কোনো উপায়ে ক্ষুধা নিবৃত্তিই ওই জীবনের লক্ষ্য। তাই শাশুড়ী উচ্চবর্ণের বাবুর সঙ্গে যোগসাজশ করে পুত্রবধূকে ধর্ষিতা হতে সাহায্য করে, জননী কন্যাকে স্বাধীনভাবে দেহ বিক্রীর লাভজনক পেশা গ্রহণে প্ররোচিত করে। অক্ষম অকর্মণ্য স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ীকে খোসামদ করে কয়েকআনা পয়সা আদায় করে নিতে গ্লানি বোধ করে না, বোনের নৈশঅভিসারের পথের সঙ্গী হয় ভাই, খদ্দেরের কাছ থেকে সিগারেট কেনার পয়সাও আদায় করে। এ-উপন্যাসে পাতু বায়েন, তার বোন দুর্গা, পাতুর স্ত্রী, অনিরুদ্ধ কর্মকার, তার স্ত্রী পদ্ম ওই অন্ত্যজ শোষিত শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ব করে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমকালের রাজনীতিক-অর্থনৈতিক আলোড়নে আলোড়িত পল্লীসমাজকে পাওয়া যায়। তেরোশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দের শিবকালীপুর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দংশনে অস্থির। বিশৃঙ্খল হয়ে যায় ওই সনাতন বিধিবিধানপূর্ণ সমাজ, দেখা দেয় নানা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। ওই সমাজে নতুন সময়ের জন্য নতুন ধরনের বিধি-বিধান তৈরি হতে থাকে আপন নিয়মে। নিত্যব্যবহার্য সকল দ্রব্য অগ্নিমূল্য হয়ে ওঠে; তার সঙ্গে জমির দামও বেড়ে যায়। ওই গ্রামের সাধারণ সদগোপ চাষীরা নগদ কিছু অর্থ পাবার লোভে জমি বিক্রি করে ক্রমশ পরিণত হয় ভূমিহীন শ্রমিকে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স বাড়িয়ে দেয়। ফলে সাধারণ কৃষকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সমাজের প্রথা বিধিবিধান অমান্য করার প্রবণতা দেখা দেয় অন্ত্যজ শ্রেণীটির মধ্যে। প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ কঠিন হয়ে ওঠার কারণে কামার, ছুতার, দাই, মুচি, নাপিত প্রভৃতি চিরকালের প্রথা মেনে বরাদ্দ ধানের ওপর নির্ভর করে সম্পন্ন গৃহস্থদের সেবা করতে চায় না। তারা চায় নগদ পয়সা এবং জংশন শহরে কাজ করে নগদ পয়সা পাওয়া সহজ বলে তারা গ্রাম থেকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে। ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের প্রাত্যহিক জীবন বিপন্ন হয়। তবে গ্রাম থেকে ব্যবসা নিয়ে শহরে গিয়েও সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পায় না অনিরুদ্ধ কর্মকার। কারখানায় তৈরি কোদাল কুড়লে ফাল সস্তায় পাওয়া যায় বলে তার কামারশালায় তৈরি দা ক্ষুর গুপ্তি ফাল কেউ কেনে না, ক্রমশ তাকে পৈত্রিক ব্যবসা ত্যাগ করে শ্রমিকদের পেশা গ্রহণ করতে হয়। সমকালীন বিভিন্ন আইনও ওই গ্রামের মানুষের জীবনে নানা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাশ হওয়া জরীপ আইন অনুসারে শিবকালীপুর গ্রামেও সেটেলমেন্টের খানাপুরী আরম্ভ হয়। গ্রামের মানুষেরা হাকিম পেয়াদা ও

সেটেলমেন্ট অফিসারদের ভয়ে ও অজানা নানা বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত দিন কাটায়। সেটেলমেন্টের জমি জরিপ শুরু হয় পৌষমাসে যখন মাঠজুড়ে পাকা ধান। জমিদার সাতদিনের মধ্যে মাঠের ধান কেটে ফেলার হুকুম দেয় কিন্তু অর্থবলহীন দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে তা করা সম্ভব হয় না। ফলে গৃহস্থের সম্বৎসরের খোরাক মাঠেই নষ্ট হয়। এছাড়া জমি জরিপ করতে আসা সরকারি কর্মচারীরা অশিক্ষিত চাষীদের সঙ্গে নানা দুর্ব্যবহারও করে, প্রতিবাদকারীকে সরকার বিরোধী অ্যানার্কিষ্ট বলে চিহ্নিত করে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এ-সব মিলিয়ে ওই সময়ের ওই জনজীবন হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত। দুর্যোগের পর দুর্যোগ এসে তাদের পীড়িত ও বিপন্ন করে তোলে।

এ উপন্যাসের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ব করে দেবু পণ্ডিত, দ্বারিক চৌধুরী, পণ্ডিত ন্যায়রত্ন ঠাকুর। এরা যাপন করে এক ধরনের আদর্শায়িত জীবন। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন ঠাকুর আধুনিক কালের বাসিন্দা হলেও তিনি বাস করেন প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক জগতে। জমিদার বংশের নিঃস্ব সন্তান দ্বারিক চৌধুরী অর্থের আভিজাত্য হারালেও, তার সুরুচি ও উন্নত সুন্দর নীতিবোধ বিনষ্ট হয় না। এ কারণে সে সবার শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ দেবু পণ্ডিত আধুনিক কালের তরুণ; সে গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী, সৎ, প্রতিবাদী, প্রজা-সাধারণের উপকারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে, গড়ে প্রজাসমিতি, নতুন জমিদার ছিরু বা শ্রীহরি পালের সঙ্গে প্রজাস্বার্থ বিষয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। জমি জরিপের কর্মকর্তাদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে কারাভোগ করে। তারাশঙ্কর দেবু পণ্ডিত-কে গড়তে চেয়েছেন ভারতীয় ঋষিদের মতো, নিরাসক্ত ত্যাগী সাধকের মতো করে এবং তার চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বাস্তব জীবনের চাইতে তাদের মনোজগত আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও প্রজাসাধারণের পক্ষ নিয়ে লড়াইএর বিবরণ রচনায়ই লেখক অধিক মনোযোগী থেকেছেন।

"গণদেবতা"য় একটি নতুন ধনিকশ্রেণীর উত্থান ও সামন্তভূস্বামীর পতনের ছবি আঁকা হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত- ভূস্বামীর প্রতিই তারাশঙ্কর গভীর সহানুভূতিবোধ করেছেন। এ-উপন্যাসে নব্যধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি শ্রীহরি পাল বা ছিরু পাল। ব্যবসা সুদের কারবার ইত্যাদি করে শ্রী হরি অর্থশালী হয়ে ওঠে, ক্রমশ সে শিবকালীপুরের জমিদার হয়ে ওঠে। সে অমার্জিত, স্থূল, ক্রূর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। অর্থের জোরে সে সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যমণি হয়ে উঠতে চায়, সেও ক্ষয়িষ্ণু জমিদার দ্বারিক

চৌধুরীর মতো সকলের শ্রদ্ধা ভালোবাসা লাভ করতে চায়; কিন্তু দ্বারিক চৌধুরীর মার্জিত আচার আচরণ স্বভাবের সৌম্যতা তার আয়ত্তে আসে না। জনগণ তাকে ভয় পায় কিন্তু ভালোবাসে না। এই গ্রামবাসী সাধারণেরা অবজ্ঞা ও অপছন্দ করলেও তাকে উপেক্ষা করার শক্তি ওই সমাজের নেই।

তারাশঙ্কর উদ্ধত অমার্জিত শ্রীহরি পালের যে বর্ণনা দেন তা এমন :

> আসরের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরু পাল; সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল। ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই দুইখানা গ্রামের নতুন সম্পদশালী ব্যক্তি। ... লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয় সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না।. এজন্য ছিরুর ক্ষোভ আছে, লোকে তাহাকে সম্মান করে না বলিয়া সেও সকলের উপর মনে মনে রুষ্ট। প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া আদায় করিতে সে বদ্ধপরিকর। তাই সাধারণের সামাজিক মজলিস হইলেই ঠিক মাঝখানে সে জাঁকিয়া বসে।[৪১]

শ্রীহরি ধূর্ত ও কূটকৌশলী। জনগণের শ্রদ্ধা অর্জনের .জন্য সে সমাজসেবার উদ্যোগ নেয়। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটি ইট-সিমেন্টে বাঁধিয়ে দেবার উদ্যোগ নেয় সে, ষষ্ঠীতলটি বাধিয়ে দেয়, কুয়ো বসায়; প্রকৃতপক্ষে এর মধ্য দিয়ে সে চণ্ডীমণ্ডপের ওপর নিজের আধিপত্য কায়েম করে। চণ্ডীমণ্ডপটি সাধারণ মানুষদের স্বাধীন সাদাসিদে জীবনের প্রতীক; উদীয়মান নব্য ধনিক তার অর্থকড়ি ও শক্তি দিয়ে সেটিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে যায়। এরপর থেকে দরিদ্র জনসাধারণের জীবন সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে চলে শ্রীহরি পাল। "গণদেবতা"য় একটি পল্লীর বিশেষ সময়ের জীবনের সার্বিক রূপ অবিকল রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

"পঞ্চগ্রাম" (১৩৫০) উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী পাঁচটি গ্রামের সমাজজীবন বাস্তবতার রূপায়ণ করা হয়েছে। এতে ব্যক্তির জীবনালেখ্য রচনা লেখকের লক্ষ্য নয়, তবে সমাজজীবনের নানা ঘটনা-অভিঘাতে ব্যক্তি-জীবনে যে-বিপর্যয় নেমে আসে, সমাজ-প্রধানদের ক্রূর অভিসন্ধিপরায়ণতা, ষড়যন্ত্র কুটিলতায় ব্যক্তিজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, তার বিবরণ রয়েছে উপন্যাসে। "পঞ্চগ্রাম"-এ সমগ্র জনজীবনের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনীতিক ও পেশাজীবনের উপস্থাপনাই প্রধান বিষয়। গ্রন্থের ভূমিকায় তারাশঙ্কর বলেছেন, 'পঞ্চগ্রামের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চাষী

মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। এ ক্ষেত্রে একটা কথা নিবেদন করি আমি নিজে যেমন দেখিয়াছি–তেমনি লিখিয়াছি। কতকগুলি হুবহু সত্য ঘটনা কাহিনীর আকারে সাজাইয়া দিয়াছি মাত্র। সমাজের পটভূমিকায় পল্লীর কথা বলিবার আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে সব কথা বলা সম্ভবপর হয় নাই। ... তবে যাহার কথকতা করিয়াছি–তাহার রূপ সম্বন্ধে আমার দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার।[৪২] তাই উপন্যাসটিকে লেখকের অভিজ্ঞতার অবিকল উপস্থাপন বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সরকারী জরিপ আইন অনুযায়ী সেটেলমেন্ট সার্ভের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী পাঁচটি গ্রাম—মহাগ্রাম, শিবকালী-পুর, বালিয়াড়া-দেঘুরিয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কনা এ উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-উপন্যাসে রয়েছে খাজনা-বৃদ্ধি নিয়ে জমিদার-প্রজায় বিরোধ; জমিদারদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল, প্রজাদের খাজনা না দেবার সঙ্কল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট, দুঃসহ অনটন এবং অভাবের কারণে ধর্মঘট ভেঙ্গে জমিদারের কাছে নতিস্বীকার, মহাজনদের কাছে প্রজাদের ঋণগ্রস্ত হওয়া, জমিদার-মহাজনের কাছে চক্রবৃদ্ধি সুদের জালে জড়িয়ে যাওয়া, জমিদারদের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে ফাটল ধরা এবং দাঙ্গা-অর্থাৎ ওই সময়ের সমস্ত সামাজিক প্রপঞ্চ উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। পঞ্চগ্রামের জনপদবাসীদের মধ্যে আছে মুসলমান চাষী, উগ্র স্বভাবের দুর্দান্ত ভীল সম্প্রদায়, চাষাবাদের বাইরে ডাকাতি করা যাদের পেশা, আছে সদগোপ চাষী সম্প্রদায়, অন্ত্যজ ডোম-মুচি-বাউরি গোত্রের মানুষ। চাষাবাদই এদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। এদের ওপরে আছে জমিদারকুল; তেজারতি করে সম্পদশালী হয়ে ওঠা মহাজন, জংশনের কলমালিকেরা।

পঞ্চগ্রামের দরিদ্র কৃষকসম্প্রদায়ের জীবনে আসে বিবিধ দুর্বিপাক। জমিদার ফসলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাত ধরে খাজনা বৃদ্ধি করে। প্রজাকুল 'বৃদ্ধি দিব না' শ্লোগান তুলে ধর্মঘট শুরু করে; কিন্তু ঐক্যে ও ধর্মঘটে অটল থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। উদরান্নের অভাব, অবিশ্বাস, জমিদারদের রটনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে জনগণ। তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তাদের জীবনে আসে বন্যা, ধ্বংস হয় ঘরবাড়ি, শস্য। মড়করূপে দেখা দেয় ম্যালেরিয়া; শিশু ও বয়স্ক মানুষের ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটে। দেখা দেয় গো-মড়ক, পঞ্চগ্রামের অর্ধেক পশু মারা যায় তাতে। উদরান্নের অভাব ঘোচাবার জন্য ভল্লরা দূরবর্তী গ্রামে ডাকাতিতে গিয়ে ধরা পড়ে। দারিদ্র্য,

জমিদারের মহাজনের শোষণ, রোগ ব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত ওই জনজীবন। ধর্মঘটের সময় স্থানীয় মহাজন, জমিদাররা প্রজাদের ঋণ দেয়া বন্ধ রাখে প্রজাদের জব্দ করার জন্য। তারা জংশন থেকে টাকা দাদন নেয়, সেখানেও নানা শর্তে তাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলা হয়। অন্নাভাব অর্থকষ্ট সহ্য করতে না পেরে বাউরি মুচি ডোম সম্প্রদায় পৈত্রিক পেশা ত্যাগ করে। চাষাবাদ ত্যাগ করে তারা জংশনে শ্রমিকের কাজ শুরু করে। জমিদার ও উচ্চবর্ণের গৃহস্থেরা এতে তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। জমিদার জমি থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেয়। কিন্তু পরোয়াহীন এই সাধারণ নারী পুরুষ কলে কাজ করে বলে, দুবেলার অন্ন সংগ্রহের নিশ্চয়তা আসে তাদের জীবনে। ভূমিজীবী সম্প্রদায় পরিণত কারখানার শ্রমিকে।

শুধু দরিদ্ররাই দুর্গত নয়, পঞ্চগ্রামের অবক্ষয়গ্রস্ত সামন্ত জমিদার পরিবারও আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে অযোগ্য উত্তরসূরি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। নিত্য-পূজা ও নিত্য-ভোগের ব্যবস্থা করতে অক্ষম জমিদার বাড়ির উত্তর পুরুষ দ্বারিক চৌধুরী বহুকালের পারিবারিক দেবতা লক্ষ্মী জনার্দনকে শ্রীহরি পালের কাছে বিক্রী করে দেয়। তিরিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলন এবং পূর্ববর্তী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ওই গ্রামেও পৌঁছে। চরকা প্রতিষ্ঠিত হয়, মদ্যপান নিবারণে সমর্থ হয় স্বেচ্ছাসেবকেরা।

এই জনপদবাসীদের শোচনীয় জীবন তারাশঙ্কর বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন; কিন্তু এই বাস্তবতাই শাশ্বত চিরস্থির এমন ধারণা তিনি দেন না। তিনি এমন একটি বাণী প্রকাশ করেন যে দুর্যোগ ওই জনপদের জীবনপ্রবাহকে বিপন্ন করে। খাজনা বৃদ্ধি, সুদ, অনাহার, কলেরা, ম্যালেরিা, দাঙ্গা, গোমড়ক, অগ্নিকাণ্ড, অনাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি দ্বারা তাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু ওই মানুষেরা অমিত শক্তির অধিকারী, অদম্য তাদের বাঁচার আগ্রহ। তাই তারা সমস্ত বিপর্যয়ের পর শুরু করে নতুন জীবন। "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসের নায়ক দেবু পণ্ডিতের চোখে পড়ে ওই জনপদবাসীদের অপরাজেয় জীবনস্পৃহা :

> দেবু দেখে আর ভাবে–আশ্চর্য মানুষ। আশ্চর্য সহিষ্ণুতা। আশ্চর্য তাহার বাঁচিবার–ঘরকন্না করিবার সাধ–আকাঙ্ক্ষা। এই মহাবিপর্যয়–বন্যা রাক্ষসীর করকরে জিভের লেহন চিহ্ন সর্বাঙ্গে অঙ্কিত; এই অভাব, এই রোগ, এই মড়কের মধ্যে ঘরের ভাঙন, জমির বালি, ক্ষেতের গর্ত–সমস্তই মানুষ এক লহমায় মুছিয়া ফেলিল।[৪৩]

গণদেবতা এবং পঞ্চগ্রাম সম্পর্কিত উপন্যাস। গণদেবতা হচ্ছে পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের ভূমিকা। গণদেবতার একগ্রামভিত্তিক পটভূমি পঞ্চগ্রাম-এ পাঁচটি গ্রামে বিস্তৃত হয়েছে। এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত জীবন অনেক বেশি বিস্তৃত, বহু ঘটনাপূর্ণ। তারাশঙ্কর ওই বিস্তৃত জনপদটির একটি সমকালীন জীবনচিত্র রচনা করার চেষ্টা করেছেন এ-উপন্যাসে, যাতে মানুষের সমস্ত সামাজিক-আর্থনীতিক-প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বিস্তৃতভাবে চিত্রিত হয়েছে। ওই সমাজ ও জনপদের জীবনধারা যেমন আছে তেমন ভাবেই চলবে, তারাশঙ্কর এমন ধারণা দেন না বরং তিনি তাঁর ধীর বিবর্তন নির্দেশ করেন। বাগদী ভূমিশ্রমিকেরা তাদের সনাতন চাষাবাদের পেশা ত্যাগ করে পরিণত হয় কারখানার শ্রমিকে। তারাশঙ্কর এ ব্যাপারটিকে অশুভ বলে মনে করেননি, বরং তার কাছে এটি একটি শুভ ব্যাপার গণ্য হয়েছে। কারণ ওই অন্ত্যজেরা এই পেশা গ্রহণ করার ফলে নগদ পয়সা হাতে পাচ্ছে, তাদের ওপর গ্রামের সমাজের চাপ ও শোষণ বন্ধ হয়েছে। ওই অন্ত্যজেরা স্বাধীন স্বতর্স্ফূত জীবন যাপন করতে পারছে। এ-ব্যাপারটিই উপন্যাসের উপসংহারে তারাশঙ্কর নির্দেশ করেছেন।

রাঢ় ভূখণ্ডের প্রেক্ষাপটে "সন্দীপন পাঠশালা" (১৩৫২) উপন্যাসটি রচিত, এ-উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭ সময়ের প্রেক্ষাপটে, "ধাত্রীদেবতা"র মতো এ-উপন্যাসেও লেখকের লক্ষ্য প্রধান চরিত্রটির বিকাশ বর্ণনা। তবে "ধাত্রীদেবতা"র নায়ক সামন্তশ্রেণীর; আর "সন্দীপন পাঠশালা"র নায়ক সদগোপ চাষীপুত্র সীতারাম। তার জীবনের লক্ষ্য একটি আদর্শ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, মেধাবী আদর্শবান ছাত্র তৈরি করা। এই লক্ষ্যে পৌছুবার পথে বাধা আসে বিস্তর। সামাজিক শক্তিমান অভিজাত বংশীয়রা চাষার পুত্রের বিদ্যানুরাগকে ব্যঙ্গ করে, বিপ্লবীদলের সদস্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকার অভিযোগ করে জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বেনামা দরখাস্ত পাঠায়। ওই পাঠশালাটি সন্ত্রাস শিক্ষা দেবার আখড়া এমন অভিযোগ এনে পুলিশ তল্লাসি চালিয়ে পাঠশালা ভেঙে তছনছ করে। বাড়ির মালিক ভয় পেয়ে ঘর ছেড়ে দেবার জন্য চাপ দেয়। পাঠশালা তুলে দিতে বাধ্য হয় সীতারাম। আবার উদ্যম নিয়ে গাছতলায় পাঠশালা বসায় এবং অদম্য অধ্যবসায়ে গড়ে তোলে একটি আদর্শ পাঠশালা। জীবনে আসে একতরফা প্রেম, পত্নীবিয়োগ, কন্যার বৈধব্য। দুঃখের তপস্যার মধ্যদিয়ে সে হয়ে ওঠে প্রশান্ত দুঃখজয়ী সন্ত।

তারাশঙ্কর এ-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালের ভূমিকায় বলেছেন, 'বাংলাদেশের শিক্ষক জীবন অবহেলিত, অনাদৃত। পাঠশালার শিক্ষক বা

পণ্ডিত মহাশয়দের তো কথাই নাই। এদের সুখ-দুঃখ অবহেলিত, সমাজজীবনে সামান্যতম সম্মান থেকেও এঁরা বঞ্চিত। ......... সীতারাম আমার কাছে বাস্তব; তার মনের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। তাকে সাহিত্যে রূপদানের বাসনা ছিল।'[৪৪] তাই এ-উপন্যাসটিকে বাস্তবের অবিকল উপস্থাপন বলে গণ্য করতে পারি। প্রধান চরিত্রটির বিকাশ বর্ণনা লেখকের লক্ষ্য হলেও একটি ব্যাপক সমাজবাস্তবতার পরিচয় এ-উপন্যাসে পাওয়া যায়। এ-উপন্যাসের চরিত্রেরা কেউই সমাজ বিচ্ছিন্ন স্বাপ্নিক নয়, বাস্তবতা বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে তারা বিকাশ লাভ করে। সমাজ তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তারাও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ-উপন্যাসে সামন্ত অভি-জাত উচ্চবিত্ত সমাজের রূপ তুলে ধরা হয়, তুলে ধরা হয় অন্ত্যজ জীবনের রূপ। ওই উচ্চবিত্ত সমাজ ক্রূর, ষড়যন্ত্রপ্রিয়, আত্মম্ভরী, অনুদার। সদগোপ এক চাষীপুত্রের বিদ্যামনস্কতাকে তারা ঈর্ষা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে। উপহাস করে। শুধু ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ওই পাঠশালা ও তার পণ্ডিতের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনতে দ্বিধান্বিত নয় তারা। মিথ্যে অভিযোগ এনে পুলিশি তদন্তের মধ্য দিয়ে পাঠশালার ক্ষতিসাধন করে। পাঠশালার সাজানো গোছানো ঘর ও আঙ্গিনাকে মধ্যরাতে এসে নোংরা করে রেখে যায় বাবু পাড়ার লোকজন। মদখেয়ে, ভাড় ভেঙে ছত্রখান করে এঁটো মাটির হাড়ি ভেঙে ছড়িয়ে, চুনকাম করা মাটির দেয়ালে কাঠকয়লার টুকরা দিয়ে সীতারামের হীন কুলের নিন্দা করে তারা অসৎ আক্রোশ নিবৃত্ত করে। হীনকুলের একজনের বিদ্যানুরাগী তাদের কাছে উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। চিরশোষিত নিম্ন-বর্ণের একজনের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস তাদের অহংকে আহত করে।

"সন্দীপন পাঠশালা" একটি পাঠশালাকে কেন্দ্র করে সমাজ-পরিবর্তনের ঈঙ্গিতবহ উপাখ্যান। সীতারাম অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তার শ্রেণীর মানুষেরা আবহমানকাল ধরে প্রথা এবং উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা শোষিত ও পর্যুদস্ত। সীতারাম বুঝতে পারে শিক্ষাই হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের মূল শক্তি। তাই সে শিক্ষার আলো জ্বালতে চায়, কিন্তু চারপাশের অন্ধকার ওই আলোকে গ্রাস করার জন্য বারবার ব্যগ্র হয়ে ওঠে। উচ্চবর্ণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তার পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে একটি ব্যক্তির জয় যেমন ঘোষিত হয়েছে, তেমনি ওই অন্ত্যজ মানুষদের নতুন জীবনস্পৃহাও রূপ লাভ করেছে। তারাশঙ্কর নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ শ্রেণীর জাগরণের ছবি আঁকেন। তিনি দেখান ওই জাগরণ ও জীবন

যাপনের ধরন বদল শুভ পরিণামই বয়ে আনে। "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসে তিনি অন্ত্যজশ্রেণীর জাগরণের শুভ পরিণামই নির্দেশ করেছেন, "সন্দীপন পাঠশালা" উপন্যাসেও নির্দেশিত হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণীটির নতুন ধরনের জাগরণের কথা। আবহমান কাল ধরে শোষিত ও অবনত মানুষেরা এখন জ্ঞানের আলোয় তাদের অন্ধকার জীবন আলোকিত করতে চায়, মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদা ও অধিকার পেতে চায়। "সন্দীপন পাঠশালা" উপন্যাসে নতুন কালের এই যুগ সত্যই উপস্থাপিত হয়েছে।

"পদচিহ্ন" (১৩৫৭) রাঢ়বঙ্গের একটি গ্রামের পটভূমিকায় রচিত। গ্রামটির নাম নবগ্রাম। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব ও পরবর্তী বছরগুলো এ -উপন্যাসের সময়-পটভূমি। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'এর কাল ১৯০০ থেকে ১৯০৮-৯ সাল পর্যন্ত। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে সে আমলের পাত্রপাত্রীদের ভাষা, সমাজের রূপ কালানুযায়ী চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছি।'[৪৫] নবগ্রাম কুলীন প্রধান, নানা মানের জমিদার বাস করে নবগ্রামে। তাদের আছে অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্যবোধ। এছাড়া ওই পল্লীতে আছে উদীয়মান বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি গোপীচন্দ্র, সামান্য অবস্থা থেকে সে কয়লা খনির মালিক হয়েছে। তার বৈভব পুরোনো জমিদারদের মনে ঈর্ষা জাগায়। জমিদারেরা নিজেদের মধ্যে যেমন বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত, তেমনি উঠতি ধনী গোপীচন্দ্রের সঙ্গেও গ্রামের-প্রতিপত্তিশালী প্রধান জমিদার স্বর্ণকমলবাবু নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত থাকে। এ-উপন্যাসে ওই সামন্ত জমিদারদের দম্ভ অহমিকার ও দ্বন্দ্ব-ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ পল্লী সমাজের উপস্থাপনা করেছেন তারাশঙ্কর। সেই সঙ্গে এ-উপন্যাসে রয়েছে অন্ত্যজ দরিদ্র শ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবন পরিচয়। তারাশঙ্কর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারে নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছেন।

"পদচিহ্ন" উপন্যাসে উপস্থাপনার বিষয় হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ও নব্য ধনিকের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করার জন্য তিনি একটি সম্পূর্ণ গ্রামের জীবনকেই উপস্থাপিত করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসে তিনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন এখানেও উপস্থাপিত হয়েছে একই চিত্র অর্থাৎ তাদের ক্ষয়িষ্ণুতা দাম্ভিকতা অনৈতিকতা চক্রান্তপরায়ণতা ঈর্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যদিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এ-উপন্যাসের নব্যধনিক হচ্ছে গোপীচন্দ্র যে সামান্য অবস্থা থেকে কয়লাখনির মালিক হয়েছে। সে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের, গোপীচন্দ্র ধীর, বিচক্ষণ ও কূটকৌশলী। গোপীচন্দ্র নতুন পুঁজিপতি শ্রেণীর সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। জমিদার স্বর্ণকমল ও নব্যধনী গোপীচন্দ্রের দ্বন্দ্ব হচ্ছে

একজন তার পূর্ব প্রভুত্ব এবং মহিমা রক্ষা করতে চায় এবং অন্যজন তার ধনের দ্বারা সমাজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দুজনের শক্তি পরীক্ষিত হয় একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে। স্বর্ণকমল তার পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিকে সজীব করতে ব্যর্থ হয় কিন্তু গোপীচন্দ্র নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নতুন স্কুল স্থাপন করে। তার শক্তি হচ্ছে তার অর্থ এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, যে গোপীচন্দ্রকেই নানাভাবে সাহায্য করে। গোপীচন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত জমিদারকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে অর্থাৎ পুরোনো শক্তিকে সে পদানত করে। তারপর সে উদ্যোগী হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও তার অধীনে নিয়ে আসার। সম্পন্ন গৃহস্থ রাধাকান্তের জীবনের ওপরও শক্তির প্রভাব পড়ে। তাতে রাধাকান্তের জীবনই নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে সে গ্রামে নতুন প্রভুরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারাশঙ্কর এ-উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের প্রতি মমতাবোধ করলেও ওই নব্যধনীটির প্রতিষ্ঠাকেও সময়ের অনিবার্য ঘটনা বলে গ্রহণ করেছেন। তারাশঙ্করের "ধাত্রীদেবতা"য় একটি জমিদার পুত্রকে বিকশিত করা হয়েছে আদর্শবাদী তরুণ হিসেবে।। এই উপন্যাসে সম্পন্ন গৃহস্থপুত্র কিশোরকে বিকশিত করা হয়েছে আদর্শবাদী হিসেবে। সে সমাজের অপাংক্তেয়দের সাহায্য করে, দুর্দশার সময় বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিশোরকে দিয়ে এ-উপন্যাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কিশোর আদর্শবাদী তবে একদিন সে মায়ের নির্দেশে নব্যধনী গোপীচন্দ্রকে প্রণাম করে। গোপীচন্দ্রও কিশোরকে প্রীতির চোখে দেখে। তারাশঙ্কর যেন দেখাতে চান যে নতুন সময়ের প্রভু পুঁজিপতি ও নতুন সময়ের রাজনীতিক নায়ক—পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে জড়িত- তারা যেন পরস্পরের শক্তিকে অনুধাবন করতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে নতুন সময়কে তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে।

মূল উপাখ্যানের পাশে সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবনের রূপও বিশদভাবে চিত্রণ করা হয়। কিশোর কোন পারিবারিক প্রেক্ষাপটে বেড়ে উঠছে তা নির্দেশ করার জন্যই অন্তঃপুর-জীবনের বিশদ বর্ণনা করেছেন তারাশঙ্কর। এর পাশাপাশি সমাজজীবনের নানা রূপও তুলে ধরেন তিনি। পল্লীর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে গৃহস্থবধূ যাপন করে শোচনীয় দুর্দশাপূর্ণ জীবন। তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় দাপটশালী বিধবা ননদ, উগ্রমেজাজের দেবর ও অন্যান্য মুরুব্বিদের দ্বারা। ভাশুর শ্বশুর দেবর বিধবা ননদ জা শাশুড়ীর একান্নবর্তী পরিবারে গৃহস্থবধূ দাসীর ভূমিকা পালন করে মাত্র, স্বামী প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুসারে ভ্রাতৃপ্রীতি প্রদর্শন করে যে-

কোনো অবিচার অন্যায় নিঃশব্দে মেনে নেয়। সংসারের অন্য সকলের যে কোনো অন্যায়কে ন্যায় বলে মেনে নেয়াটাই ওই সমাজের সম্মানিত প্রথা রূপে স্বীকৃত। ওই সংসারে পালা করে বউদের কাজ করতে হয়, কারো ভাগে 'কোনদিন পড়ে বাসন-মাজা ঝাঁট-দেয়া এঁটো কাঁটা পরিষ্কার এই সবের কাজ, কোন দিন পড়ে বাটনা-বাটা কুটনো-কোটা জলতোলার কাজ।' প্রবাসে চাকুরিরত স্বামীর কাছে স্ত্রীর মিথ্যে অবাধ্যতার ফিরিস্তি দিয়ে ভাসুর দেবরেরা চিঠি দিলে, কুপিত স্বামী রূঢ় ভৎর্সনাপূর্ণ চিঠি লিখে স্ত্রীকে শাসন করে। সত্য-মিথ্যা বিচারের প্রয়োজনবোধ করে না। ওই মধ্যবিত্ত কুলীন পরিবারের বিধবা কন্যা সংসারের কর্ত্রীর ভূমিকা পালন করে দাপটের সঙ্গে। নিষ্ঠুরতা, রূঢ়ভাষণ, নির্মমতা-পীড়িত ওই একান্নবর্তী পরিবারগুলোর বধূ ও সন্তানদের জীবন। লেখক ওই জীবনের যে বর্ণনা দেন তা এমন :

> 'কিশোরদের বাড়িরও ওই চারুদের বাড়ির মত অবস্থা। একান্নবর্তী পরিবার। কিশোরের বাপের ছয় সহোদয়, সাত বউয়ের বাড়ি, বাড়ির কর্ত্রী কিন্তু কিশোরের পিসীমা। তার শাসনে মধ্যে মধ্যে কিশোরের মাকে কাঁদতে হয়, কিশোর বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমন করেন কিশোরের এক কাকা, নির্মম হস্তে দমন করেন, এখনও কিশোরের পিঠে বেত পড়ে। কিশোরের বাপ ভাইদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ, তবু তিনি এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না। জ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি অগ্রজভক্ত চারুর বাপের মতই অনুজভক্ত। ভক্তি বা প্রীতিই এখানে একমাত্র কারণ নয়, প্রধান কারণ এই রীতিই হল সমাজপ্রচলিত প্রশংসিত রীতি ও বিধান।[৪৬]

সংসারের ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব থাকে বিধন ননদ, কন্যা কিংবা শাশুড়ীর ওপর। সন্দিগ্ধচিত্ত কর্ত্রীরা পরিবারের মেয়ে সদস্যদের পদক্ষেপ, ক্রিয়াকলাপের দিকে নজর রাখে, তাদের ধারণা ভাড়ারের দ্রব্য চুরি করেই অল্পবয়সী পুত্রবধূ বা কন্যারা প্রসাধন দ্রব্য কেনার পয়সা জোগাড় করে। কর্ত্রী যেমন সন্দিগ্ধচিত্ত ও সতর্ক, পুত্রবধূরাও তেমনি চতুর ও চৌর্যবৃত্তিতে দক্ষ।

১৯০৬ সালের বাঙলার পল্লীসমাজের উচ্চস্তরে আছে কৌলিন্য প্রথার চাপ, আভিজাত্যে ও ভাঙ্গনের মুখোমুখি নিম্নস্তরের মধ্যে আছে জমিদারের প্রতি অগাধ আনুগত্য ও ভীতি। পেশা হিসেবে নিম্ন শ্রেণীটি চাষাবাদ ছাড়া অন্য কোনো পেশার কথা ধারণাও করতে পারে না। যাদের নিজস্ব জমি নেই, তারা ভূমি-শ্রমিক হিসেবে সম্পন্ন গৃহস্থদের চাষেই খাটে। আপন

আপন গ্রামের গণ্ডির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায় তারা। লেখক ওই জীবন বর্ণনা করেন এভাবে :

> এই উনিশ শো ছ'সালে লোকে চাষ ছাড়া অন্য কিছুতে মজুর খাটবে না। তাও চালের মণ পাঁচ সিকে থেকে ছটাকা। টাকায় তেরো সের চাল অর্থাৎ তিন টাকা মণ হলে, দেশে আকাড়া অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলে হাহাকার ওঠে, চাষ ছাড়া মানুষ কিছু বুঝে না। চাষের কাজে স্থায়ী কৃষাণ জীবিকা যাদের নাই, তারা শ্রমিক হিসেবে ওই চাষেই খাটে। আর আছে বছরে একবার খ'ড়ো ঘরের চাল–ছাওয়ানোর কাজ। তাও তারা আপন আপন গ্রামের মধ্যেই মজুর খাটার গণ্ডি সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়। কেবল স্বর্ণবাবুর মত ব্যক্তিদের হুকুমে গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে আসতে বাধ্য হয়; কারণ তাঁরা জমিদার, জমিদারের হুকুম অমান্য করতে নাই–এইটাই চলিত শিক্ষা এবং অমান্য করবার মত সাহস, সাহস দূরের কথা, কল্পনাও তারা করতে পারে না। তাছাড়া নিজেদের গ্রামের গৃহস্থদের চাপ থেকে, অত্যাচার অবিচার থেকে বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়স্থল এই জমিদার।[৪৭]

ওই সমাজ কৌলিন্য প্রথার বিষ-জর্জরিত দুষ্ট ক্ষতযুক্ত সমাজ। ওই সমাজে পাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হতো কৌলিন্যের বিচারে। কুলীন জমিদারেরা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জামাতাদের ঘরে রাখার ব্যবস্থা করে যায়। ওই সমাজে কুলীন পুত্রকন্যার বিবাহে এক অভিনব প্রথা প্রচলিত ছিলো। দুষ্কুল থেকে কন্যা আনায় কুলীনেরা বিশ্বাস করতেন দোষ নেই। কিন্তু অকুলীন পুরুষ সম্পদ শিক্ষা স্বাস্থ্যরূপ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও সুপাত্র বলে গণ্য হতোনা। ফলে অযোগ্য কুলীনদের হাতে কন্যা সমর্পণ করে জামাতাকে ঘরজামাই করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এর ফল হয়েছে ভয়াবহ, ভবিষ্যৎকালের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে কুলীন জামাতার উত্তরাধিকারীরা কুৎসিত কলহে লিপ্ত হয়। জামাতাদের প্রত্যেকের বাড়িতে দুখানি হিসাবে ঘর, কিছু জমি, কিছু জমিদারীর মুনাফা, পুকুর প্রভৃতিতে কিছু অংশ দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে শরিক করে দিয়ে যান পূর্বপুরুষেরা এবং এই শরিকেরা পরস্পরকে ঘৃণা করে। কটূক্তি শ্লেষ উপহাস বাক্যের মধ্য দিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। প্রাচীন জমিদার বংশের অধিকাংশ তরুণ উত্তরপুরুষই অধঃপতিত; মাতাল ও চরিত্রহীন। অন্ত্যজদের বিধবা তরুণী কন্যাদের সঙ্গে নিশিযাপন করে, তারা মদ খেয়ে বীভৎস চীৎকার করে পাড়া মাথায় করে। গৃহস্থ পাড়ার মধ্যে খিড়কির আশেপাশে এবং স্নানের পুকুরের আশেপাশেও তারা মেয়েদের দেখার জন্য

বন্দুক হাতে মিথ্যা পাখির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। অভিভাবকদের কাছে এর প্রতিবিধান চাওয়া হলে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কখনো মিষ্টি কথায় জানানো হয় যে ওই ছেলেদের শাসন করা হবে। কখনো কখনো অভিযোগকারীকেই ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ ওই অনৈতিকতা দূষণীয় বলে গণ্য হয় না অভিভাবকদের কাছেও। তারা প্রকারান্তরে ওই অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেন।

"চিন্তামণি" (১৩৫৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের মধুবনী নামের একটি মফস্বল শহরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের পল্লীজীবনের কাহিনী। মধুবনীতে থানা আদালত জেলখানা আছে, আছে ঘিঞ্জিবাজার এলাকা। বাজারে রয়েছে তিনখানা চালকল। বাজার পেরিয়ে কালছে রাঙা কাঁকর মাটির পথ দিয়ে কিছু দূর গেলে গ্রাম। চাষীগৃহস্থ, তাঁতী, মুচি ইত্যাদি পেশার মানুষ সেখানে বাস করে। চিন্তামণি, তার দিদি, রঘু, তার দুই স্ত্রী বিরজা ও দুর্গা, গৌরাঙ্গ, তার মা, রাইস মিলের মালিক নীলকণ্ঠ বাবু, তার কর্মচারী পটল, গৌরের চাচা চাঁদ, পড়শি কালাচাঁদ, হারান প্রমুখ এ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রী। বিধবা তরুণী চিন্তামণি অভাবের কারণে মধুবনীর চালকলের মালিক নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়িতে ঝির কাজ করতে আসে চব্বিশ পরগনার খিদিরপাড়া গ্রাম থেকে। সংসারে তার একমাত্র আশ্রয় বিধবা দিদি। মধুবনীতে এসে পরিচয় ঘটে গ্রামের চাষী গৃহস্থ তরুণ গৌরাঙ্গের সঙ্গে, গৌর নীলকণ্ঠের বাড়িতে নিয়মিত দুধ দেয়। বন্ধু ও প্রতিবেশী রঘুর দ্বিতীয়া স্ত্রী সন্তানসম্ভাবা দুর্গা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে, ডাক্তার তাকে খাওয়াবার জন্য একটি বিলিতী ফুড জোগাড় করতে বলে। দ্বিগুণ দাম দিতে স্বীকৃত হয়েও কোন দোকানে রঘু ফুডটি খুঁজে না পেয়ে নীলকণ্ঠের কাছে যায়। ওটি জোগাড় করে দেবার মিনতি জানায়। নীলকণ্ঠের সঞ্চয়ে দুটি থাকলেও সে তা দিতে সম্মত হয় না, চিন্তামণি একটি ফুড চুরি করে গৌরাঙ্গকে দিয়ে দুর্গার কাছে পাঠায়। নিয়মিত গৌরের বাড়িতে দুধ আনতে যাবার কারণে এবং ফুড দেবার কারণে গৌরের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিয়মিত রাতে তারা রাইস মিলের উঠানে মিলিত হতে থাকে। গৌরের মনে হঠাৎ সমাজের ভয় এবং একটি কিশোরী স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা দেখা দিলে সে চিন্তামণির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চায়। যুদ্ধের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, চাল ডাল তেল কাপড়, এমন কি কাঁচা টাকা রূপার দামও অত্যন্ত বেড়ে যায়। গৌরের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের বাজারে চালের দাম চড়ে যাবার কারণে লোভে পড়ে কৃষকেরা সমস্ত ধান বিক্রি করে টাকা ঘরে তুলতে থাকে। ক্রমে বাজার থেকে ধান

উধাও হয়, বাজার সওদা করার পূর্বতন রীতি পদ্ধতি বদলায়, খাজনা বাড়ে। লোহা রেজগি উধাও হয়, রূপার বাজার চড়ে যায়। অনাহারে মধুবনীর অর্ধেক গৃহস্থ মারা যায়, অধিকাংশ পালায়। গৌরের মা মারা যাবার পর চিন্তামণি গৌরকে নিয়ে তার দিদির কর্মস্থল বড় নিছিপুরের কারখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

যুদ্ধের ফলে আর্থনীতিক কারণে কীভাবে বিশৃঙ্খল ও নষ্ট হয়ে যায় পল্লীর সাধারণ গৃহস্থজীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের "চিন্তামণি" উপন্যাসে তা নির্দেশ করা হয়েছে। এ-উপন্যাসে যুদ্ধকালীন গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের রূপ পাওয়া যায়। মফস্বল শহরের প্রেক্ষাপটে কাহিনী শুরু হলেও মধুবনী গ্রাম এবং বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের পল্লীর সাধারণ জীবনের উপস্থাপনা ঘটেছে এ-উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব গ্রামগুলোতে পৌছুবার আগে জীবন ছিলো সাদাসিদে স্বচ্ছন্দ। যুদ্ধের প্রভাবে পল্লী-বাঙলার গৃহস্থজীবন হয়ে পড়ে নানাভাবে বিপর্যস্ত, ধ্বংস হয় বহু মূল্যবোধ। ওই জীবন হয়ে ওঠে অপরিমেয় ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রিত। ক্ষুধাই একমাত্র নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে ওঠে বলে ওই জীবনে সনাতন নানা মূল্যবোধ আর মান্য বলে বিবেচিত হয় না। কোনো রকমে অস্তিত্ব রক্ষাই হয়ে ওঠে বড়ো কথা। ক্ষুধার কারণে সোমত্ত বিধবা বোনকে একলা দূরদেশে মধুবনীতে কাজ নিয়ে যেতে দিতে বাধ্য হয় বড়ো বোন। নিজেও নতুন গড়ে ওঠা কারখানা শহরে এসে কুলি ব্যারাকে ঝিয়ের কাজ শুরু করে। মুনাফার লোভে মহাজনেরা গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছেদ সাধন করে সেখানে বসায় নানা কারখান, কারখানা ঘিরে গড়ে ওঠে কুলি ব্যারাক। শ্রীসম্পন্ন গৃহস্থ জনপদ পরিণত হয় কুৎসিত কারখানা ও কুলিব্যারাক অঞ্চলে। ক্ষুধাতাড়িত গৃহস্থ বৌ-ঝিয়েরা কুলিব্যারাকে রাঁধুনির কাজ করতে আসে, এ কাজে ক্ষুধানিবৃত্তির নিশ্চয়তা এলেও ওই নারীদের জীবন অন্যভাবে দুর্দশা ও কলুষগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কুলিব্যারাকের উচ্ছৃঙ্খল পুরুষেরা বেপরোয়াভাবে ওই নারীদের সম্ভোগ করে। পেটের ক্ষুধা সইতে না পেরে কাজ করতে আসা ওই নারীরা কুলিপুরুষদের জৈবিক-ক্ষুধাও মেটায়। এজন্য পুরুষগুলোর যেমন মাথাব্যথা নেই, নারীদের তেমনি সংস্কার ধর্মাধর্ম ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ নেই। চিন্তামণির বোনের জবানীতে ওই উচ্ছৃঙ্খল ক্ষুধাতাড়িত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় :

> কী দুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদৃষ্টে ছিল। কিরূপ হৈ চৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কতবাড়ী উঠিয়াছে অবাককাণ্ড দেখিয়া তুমি চোখের পলক

> ফেলিতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় মাতালগুণ্ডা গিজ গিজ করিতেছে। আমার মত শতাবধি পোড়া-কপালী ঝি কাজ করিতে আসিয়াছে, কাহারো ধর্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে, কোনমতে ধর্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি । দুই স্থানে বাসন মাজিয়া তের টাকা করিয়া ছাব্বিশ টাকা পাই।[৪৮]

পেটের ক্ষুধার কাছে গৌণ হয়ে যায় মান অপমানবোধ, সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রশ্ন। লম্পট হয়ে ওঠে 'দেবতা', যার পরিচয় পাওয়া যায় চিন্তামণির দিদির কথায় :

> বৈন চিন্তামণি আমি বড় নিছিরপুর আসিয়াছি জানিবা। না আসিয়া কি করিব আমার কে আছে আমাকে পুষিবেন...বড় নিছিপুরে আমি ভূষণ বাবুর বাসায় আসিয়াছি। ভূষণ বাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের হালদার মশায়ের বড় জামাই তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়াছিলাম। কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রকাশ করি নাই। আমি ভূষণ বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছি। তিনি এমন ভালো লোক তাহা জানিতাম না। আমাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন।...ভূষণবাবুকে দেবতা বলিয়া জানিয়া পায় ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি ...।[৪৯]

''চিন্তামণি'' উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট আর্থিক সঙ্কটের ফলে কীভাবে পল্লীবাঙলার জীবন বিপন্ন বিপর্যস্ত এমন কী উম্মুল হয়ে যায় তার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পড়ে মানুষ তাদের ভিটামাটি থেকে উম্মুল হয়, তারা প্রথাগত নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে শুধু জীবন রক্ষার জন্য নানারকম শোষণের কাছে আত্মসমর্পন করে। গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়, গ্রামবাসীরা শহরের দিকে ছুটতে থাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-উপন্যাসে আর্থিকভাবে বিপন্ন গ্রামের বাস্তব রূপ উপস্থাপিত করেছেন।

বনফুলের ''দ্বৈরথ'' (১৩৪৪) উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে দুই শক্তিমান জমিদারের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কাহিনী। ''দ্বৈরথ'' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চারজন—চন্দ্রকান্তি, উগ্রমোহন, বহ্নিকুমারী, গঙ্গাগোবিন্দ। পরাক্রান্তশালী জমিদার উগ্রমোহন জমিদার চন্দ্রকান্তের বোন বহ্নিকুমারীর সঙ্গে বিবাহিত হয়। উগ্রমোহন স্বভাবে উগ্র, দাঙ্গাপ্রিয়, দুর্জয় প্রতাপশালী। জমিদার চন্দ্রকান্ত এর বিপরীত, অন্তর্মুখী, দার্শনিক ভাবুকতাপূর্ণ, কূটকৌশলে দক্ষ, তবে উগ্রমোহনের মতো উগ্র নয়। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে উগ্রমোহনের জমিদারীর নানা কাজ নিয়ে বিরোধ লেগেই থাকে। অবিবাহিত নিঃসঙ্গ চন্দ্রকান্তের

বেঁচে থাকার একমাত্র আনন্দই হয়ে ওঠে উগ্রমোহনের সঙ্গে জমিদারীর নানা ব্যাপার নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদে জড়িয়ে থাকা, চন্দ্রকান্ত উগ্রমোহনকে নানাভাবে হেনস্থা করে। কখনো চন্দ্রকান্তের অধীনস্থ কর্মচারীরা চন্দ্রকান্তের আদেশে রাতের অন্ধকারে উগ্রমোহনের জলমহল লুট করে এবং ভোরবেলা সমস্ত মাছ উগ্রমোহনের কাছে উপঢৌকন রূপে পাঠানো হয়। কখনো চন্দ্রকান্ত জমিদার উগ্রমোহনের মহাজন প্রজাকে জমিদারের অবাধ্য হতে প্ররোচিত করে। উগ্রমোহনও এর পাল্টা জবাব দেয়। তবে চন্দ্রকান্তের মতো ঠাণ্ডা মাথায় কৌশলে কাজ করতে পারে না সে। দাপট ও শক্তি দিয়ে যেমন প্রজাদের শাসন করে তেমনি শক্তি দিয়ে চন্দ্রকান্তকে পরাভূত করতে চায়। কোনো বিশেষ কালের ও সমাজের বাস্তবতা ও জীবনকে এখানে পাওয়া যায় না। এ-উপন্যাস দুই বয়স্ক শিশু জমিদারের বিত্ত ও দর্পের কাহিনী, প্রজাদের ওপর তীব্র অত্যাচার ও প্রবল দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শনের গল্প। এ-উপন্যাসটিকে তাই জমিদার জীবনের রোমান্স বলা যায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ''ষোল আনা'' (১৩৩২) উপন্যাসের পটভূমি 'বর্দ্ধমান ও বীরভূমের সীমান্ত প্রান্তে ছোট্ট একখানি গ্রাম', আর ওই গ্রামে না আছে ডাক্তারখানা, না আছে ইস্কুল, না আছে পোস্টাপিস—রেল ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে।' এ-উপন্যাসেও পাওয়া যায় সে-পল্লীজীবনকে, যেখানে দারিদ্র্য, ইতরতা, লোভ, চক্রান্ত, ব্যভিচার সাধারণ ব্যাপার। ওই সমাজের নৈতিকতা শিথিল, সেখানে বিধবা তরুণী সকলের চোখের সামনে উপপতির সাথে বাস করে, সমাজবাসীরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো খারাপ কাজ করে, এবং তারা প্রায় সবাই দরিদ্র। তারা যাপন করে আদিম জীবন। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ জড়পদার্থ, শুধু দু-একজন তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে। শৈলজানন্দ পল্লীজীবনের চিত্র এঁকেছেন মোটা দাগে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ''সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'' (১৩৫২) বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দশকের প্রেক্ষাপটে রচিত। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুমারদহ, রূপাপুর ও নবীপুর নামক তিনটি গ্রাম এর পটভূমি। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন 'বাস্তবে এই দুখানি গ্রামের নাম অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনেই আমি এদের নতুন নামকরণ করেছি।'[৫০] ক্ষয়িষ্ণু জমিদার কুমার বিশ্বনাথ, উদীয়মান বেনিয়া লালা হরিশরণ, বিশ্বনাথের পত্নী অর্পণা, কুমার সম্প্রদায় এ-উপন্যাসে পাত্রপাত্রী। রূপাপুরের উপন্যাসটির প্রথমাংশে রয়েছে কুমারদহের প্রাচীন, ঐশ্বর্যশালী, উগ্র ও শক্তিমান জমিদার বংশের শেষ সন্তান কুমার বিশ্বনাথের

জীবনকাহিনী। বিশ্বনাথ অবক্ষয়গ্রস্ত জমিদার, খাজনার টাকার জন্য তাকে হাত পাততে হয় উঠতি বেনিয়ার কাছে; তার রাত কাটে বন্য ওরাং নারী সম্ভোগে ও মদ্যপানে, রং মহলে। জমিদার জীবনের বাস্তবতা, সেরেস্তার কাজ, পারিবারিক জীবন, রং মহলের অমিতাচার ইত্যাদি কোনো কিছুই বিশদ ও যথাযথ উপস্থাপিত হয় নি উপন্যাসে; প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্কের বিবরণও রচিত হয় নি উপন্যাসে। বাঙলার জমিদারদের সম্পর্কে যে-সব কিংবদন্তী লোকসমাজে প্রচলিত আছে, যেমন তারা ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় উগ্র, অমিতাচারী ও সম্ভোগমত্ত বেহিসাবী কিন্তু মহৎ—এসবই লক্ষ করা যায় কুমার বিশ্বনাথের মধ্যে। ভগ্ন রং মহলে ওরাং নারী সম্ভোগ করে, মদ খেয়ে তার রাত কাটে। স্ত্রী অপর্ণা বিদুষী ও সুন্দরী; অন্তঃপুরে সে উপেক্ষিতার জীবনই কাটায়। নিঃশব্দে অর্পণা স্বামীর উপেক্ষা মেনে নিয়ে বই পড়ে সময় কাটায়। সে বেনিয়া হরিশরণের কাছ থেকে খাজনার টাকা ধার করতে বাধ্য হয়, আয়ের উৎস বাৎসরিক মেলার ইজারাও পাঁচ বৎসরের জন্য হরিশরণকে দিতে বাধ্য হয় কিন্তু মেলায় যাতে হরিশরণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় সেজন্য রূপাপুরের দুর্ধর্ষ কামারদের মেলায় দাঙ্গা বাধাবার জন্য ভাড়াও করে। কামারপাড়ায় গিয়ে স্বামী পরিত্যক্তা স্বাস্থ্যবতী কামার বউ ভানীকে দেখে তাকে অধিগত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। মেলা থেকে রাতের অন্ধকারে তাকে অপহরণ করতে লোক পাঠায়। ভুলক্রমে অপহরণ করা হয় কামারদের মাতবরের স্ত্রীকে, ফলে জমিদার জড়িয়ে পড়ে আরেকটি ঝামেলায়--কামারদের ক্রোধ ও আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। চড়ারঙে জমিদারের উগ্র প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চিত্রণ করেছেন লেখক।

লালা হরিশরণের কঠোর কর্মজীবন বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চাইলেও একসময় লেখক ঝুঁকে পড়েছেন সদ্যধনী আভিজাত্য-অভিলাষী এই বেনিয়ার ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার চিত্রণে। অমিত ধন আয়ত্তে এনেও জমিদারের মহিমা ও আভিজাত্য তার আয়ত্তে আসেনি। জনগণ ধনের জন্য তাকে সমীহ করলেও জমিদারের শ্রদ্ধা ও বিনীত ভক্তি তাকে প্রদর্শন করে না। কুমারদহকে নিশ্চিহ্ন করে তাই সেখানে সে নতুন গ্রামের পত্তনের স্বপ্ন দেখে, যে গ্রামের নাম হবে হরিশরণপুর। নানা বিষয়ে জমিদারকে হেয় করতে পারার মধ্যে পায় চরম আনন্দ। উপন্যাসটিতে পাওয়া যায় ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের অন্তঃসারশূন্য দম্ভ ও পরাজয়ের কাহিনী, আর শ্রেষ্ঠীর ঈর্ষার গল্প। রূপাপুরের কামারদেরও জীবনের খণ্ড অংশের পরিচয় দেয়া হয়। হাতুড়ি ঠুকে লোহা গালিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করে— এ তথ্য জানা

যায়, তারা দুর্ধর্ষ ডাকাত দাঙ্গাবাজ নিষ্ঠুর তাদের এই পরিচয়কেই প্রধান করে তোলা হয় রচনায়। ''সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'' ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ও নব্যধনিকের লড়াই-এর উপাখ্যান যাতে জয় হয়েছে নব্য ধনিকের। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই জয়ের উপাখ্যান সমাজের বিস্তৃত পরিচয় উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে রচনা করতে পারেন নি, উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে দুই ব্যক্তির প্রতিযোগিতার কাহিনী।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ''দ্বীপপুঞ্জ'' (১৩৫৩) উপন্যাসে সময়ের উল্লেখ করা না হলেও পাত্রপাত্রীদের জীবনাচরণ পেশা ইত্যাদি থেকে অনুমান করা চলে যে বিংশশতাব্দীর প্রথম অংশের বাঙলা দেশের কোনো একটি গ্রামের সমাজজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লেখক উপন্যাসে গ্রামের নামও বলেন নি; তবে প্রথম সংস্কারণের ভূমিকায় বলেছেন এই বইয়ের পটভূমি পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম। সে-গ্রামের পরিকল্পনায় লেখকের স্বগ্রামের একাংশের অনেক মিল রয়েছে। লেখক তাঁর ''আত্মকথা''য় বলেছেন : 'হরিবংশে' (পরিবর্তিত নাম 'দ্বীপপুঞ্জ') আমাদের সদরদি গ্রামের অনেকেই এসে ভিড় করেছিল। আমাদের মধ্যপাড়ার উত্তরে ছিল সাহাপাড়া। দোকানপাট, ছোট-খাট ব্যবসাবাণিজ্যই ছিল এদের জীবিকা। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূরে যে শহরটি আছে, তার নাম ভাঙ্গা। ... আমাদের গ্রামের সাহা সম্প্রদায়ের অনেকেরই দোকানপাট ছিল সেই ভাঙ্গা শহরে। ...সেই সাহাপাড়ার অনেকেই এসে ভিড় করেছিলেন আবার প্রথম উপন্যাসে।'[৫১] এ-উপন্যাসে ধনী মহাজন নবদ্বীপ সা, তার পুত্র মুরলী, পুত্রবধূ মনোরমা, প্রতিবেশী ফটিক, মধু সা, মধু সার কন্যা বেঙ্গী, সুবল, সুবলের স্ত্রী মঙ্গলা, বিনোদ, বিনোদের মা, আলতা, আলতার মা প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়।

উপন্যাসের প্রথমাংশে লেখক এক ক্ষুদ্র গ্রামের ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের বর্ণনা করেছেন এবং শেষাংশে বর্ণনা করেছেন ওই সমাজের এক বিবাহিতা নারীর অবৈধ সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। ওই গ্রামবাসীরা সকলেই হরিভক্ত বৈষ্ণব। ওই সামাজিক জীবনে নানা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড আছে, অবৈধ পরকীয়া প্রণয় আছে, মহামারীর উপদ্রব আছে, অপরিমেয় দারিদ্র্য আছে, গৃহস্থ নারীদের উচ্চকণ্ঠ কলহ ও কুৎসা রটনা আছে। ওই সমাজের বিশিষ্ট ধনী নবদ্বীপ সা। তার পুত্র মুরলী সুদর্শন নিষ্কর্মা এবং লম্পট। কৌশলে কিংবা বলপ্রয়োগে নারীদেহ সম্ভোগই তার কাজ। পিতা এজন্য তাকে ভৎর্সনা করলেও তার খরচাদির টাকা দিতে কার্পণ্য করে না। গ্রামের সবাই গোপনে মুরলীর নিন্দা করলেও

প্রকাশ্যে কেউ তার সমালোচনা করার সাহস পায় না, কারণ প্রায় প্রতিটি গৃহস্থই নবদ্বীপ সার কাছে ঋণী। মুরলী একসময় প্রতিবেশী সুবলের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। সুবলের স্ত্রী মঙ্গলা ইতিপূর্বে সন্তানাদি না হবার জন্য বন্ধ্যানারীর অপবাদ নিয়ে বেঁচে ছিলো। মুরলীর সঙ্গে সম্পর্কের পর সে সন্তানসম্ভবা হয়। মুরলী তার প্রতি গভীর ভালোবাসা বোধ করে এবং তাকে নিয়ে নতুন জায়গায় নতুন সংসার গড়ার কথাও ভাবে। মঙ্গলা যেতে রাজি হয় না। উপন্যাসের শেষাংশে এই সন্তানসম্ভবা নারীর মনোগত টানাপোড়েন উপলব্ধিবোধ ও অনুভূতির পরিচয় তুলে ধরা হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ''দ্বীপপুঞ্জ'' উপন্যাসে পল্লীবাঙলার অসংখ্য দরিদ্র পল্লীর একটির রূপ উপস্থাপিত হয়েছে।

এ-সময় পল্লীনির্ভর স্বলপসংখ্যক এমন কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে যেগুলোতে একটি বিশেষ ভূখণ্ডের বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবন প্রথা সংস্কৃতির পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে। এ ধরনের উপন্যাসকে আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাসের গোত্রভুক্ত করা হয়েছে। এ-শ্রেণীর উপন্যাসে নির্বিশেষ পল্লীজীবনের উপস্থাপনা লেখকের লক্ষ্য নয়। এখানে তুলে ধরা হয়েছে এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রথা ও দেশাচার, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, লৌকিক উৎসব, বাচনভঙ্গির অনুপুঙ্খ বিবরণ। এ-শ্রেণীর কোনো কোনো উপন্যাসে আঞ্চলিক রঙ যথাযথ বিধৃত হয়েছে, কোনো কোনোটিতে আঞ্চলিক রঙের প্রতিভাস সৃষ্টি হয়েছে। যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ''উপনিবেশ' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'' ইত্যাদি।

''উপনিবেশ'' (পত্রিকায় প্রকাশ : ১৩৪৯-৫০) প্রথম খণ্ডের পাত্রপাত্রীরা সভ্যতা থেকে দূরে অবস্থিত এক দ্বীপের অধিবাসী। ওই দ্বীপে আইন ও সমাজের শাসন শিথিল, জীবন সেখানে আদিম বা বর্বর। তবে লেখক ওই দ্বীপখণ্ডের আদিম জীবনের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে সমর্থ হয় নি, তিনি ওই দ্বীপবাসীদের প্রবৃত্তিগত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বর্ণনা করেছেন। এটিকে আপাতদৃষ্টিতে আঞ্চলিক রঙবাদী বা আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মনে হতে পারে; তবে এটি প্রকৃত আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাস নয়, যদিও তার প্রতিভাস এতে সৃষ্টি হয়েছে।

বরিশাল নোয়াখালির সমুদ্র মোহনার একটি কল্পিত দ্বীপের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত। লেখক ওই দ্বীপটির নামকরণ করেছেন চর ইসমাইল। এই ভূখণ্ডটির বাস্তবতা অস্তিত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন ''চর ইসমাইল' নামটি

বাস্তব না হইলেও বরিশাল ও নোয়াখালি সামুদ্রিক মোহনায় অনুরূপ স্থান বিরল নহে এবং কাহিনী বর্ণিত অপরিচিত ধরনের মানুষগুলিকেও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি গল্পই লিখিয়াছি সুতরাং কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন অবান্তর। তবে উপাদান এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি।''[৫২] লেখক বলেছেন এ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রী ও কাহিনী কল্পিত হলেও এর উপাদান বা জীবন যাপনের রীতিপদ্ধতি ও প্রতিবেশ বাস্তব। লেখক উপন্যাসের ভূমিকায় বলেন যে ব্যক্তি বিশেষের নয়, ওই অঞ্চলের সমষ্টির বা গোষ্ঠীর জীবনাচরণ-আবেগ-আলোড়নকে তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য। নিম্নবঙ্গের নদীসমুদ্রের অঞ্চলে মাটির মতোই যেখানে সমাজ ও জীবন অপরিণত এবং আদিম, সেই আদিম জীবনের রূপায়ণই তাঁর লক্ষ্য। এক্ষেত্রে মিখাইল শলোকভের প্রভাবের কথা বলেন তিনি; '...ডন কোজাকদের নিয়ে শোলোকভের সেই আশ্চর্য সৃষ্টি-সেখানে ব্যক্তি চরিত্র মুখ্য নয়, আলোড়িত বিলোড়িত একটা বিপুল গোষ্ঠীর প্রাণবন্যায় ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে গেছে এবং বিলিতী অর্কেস্ট্রার বহু যন্ত্রের হার্মনির মতো বিচিত্রের অখণ্ডতা যেখানে ধ্বনিত হয়েছে সেইরকম ভাবে একটা সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে আমি প্রলুব্ধ হয়ে উঠলাম। চর ইসমাইলের পটভূমি তার আদিমতার স্বরলিপিতে বহু চরিত্রের যন্ত্রকে ঐকতানে বাজিয়ে তুলল।' 'ভূমিকায় তিনি এও জানান যে নিম্নবাংলার নদীসমুদ্রের দেশে মাটির মতোই সমাজ আর জীবন যেখানে অপরিণত, তার একটা অপরূপ রূপ, আমার কিশোর কল্পনাকে রোমাঞ্চিত করে রেখেছিল।'[৬৩] শলোকভের প্রভাবে একটি দূরবর্তী ভূখণ্ডের সমাজজীবনের রূপায়ণ লেখকের লক্ষ্য হলেও তিনি ওই জীবনের সম্পূর্ণ রূপ বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত করেন নি। তিনি দূর দ্বীপের রোমান্স রচনা করেছেন।

উপন্যাসের শুরুতে চর ইসমাইলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ জলদস্যুদের ঘাঁটি চর ইসমাইল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পরিণত হয় সমৃদ্ধ বাজারে। সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকঘর, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ছোটখাট কাছারী সবই সেখানে আছে। বাসিন্দাদের অধিকাংশ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী থেকে আসা ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, কিছু পরিমাণে মগ ও একদল জেলেও সেখানে বাস করে। কম করে হলেও ওই দ্বীপে দেড় হাজার মানুষের বসতি। সপ্তাহে একদিন খুব বড় করে হাট বসে। চর ইসমাইলের অধিবাসীরা বছরে ছয় মাস মাত্র বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে। চৈত্র থেকে আশ্বিন পর্যন্ত নদী থাকে অশান্ত, ঝঞ্ঝাময়, ঘূর্ণি সংকুল। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ

সেসময় একেবারে বন্ধ থাকে। এমন একটি সময়ের সেই সব সভ্য ও অর্ধসভ্য মানুষদের নিয়ে এই কাহিনী রচিত হয়েছে বলে লেখক জানান। লেখক দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিচয় দিয়েছেন বিস্তৃতভাবে; কিন্তু জীবনই হয়ে উঠেছে সমস্যা। দ্বীপবাসীদের সামাজিক জীবন, কর্মজীবন, প্রাকৃতিক প্রতিবেশ, বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল প্রতিবেশের সঙ্গে দুঃসহ সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, সামাজিক সংস্কার, পারিবারিক জীবনাচরণ কোনো কিছু উপস্থাপিত হয়নি। প্রায় দেড় হাজার মানুষের বসতির ওই দ্বীপের মাত্র চারটি চরিত্রের হৃদয়গত সমস্যা ভাবনাচিন্তা ও জীবনকে তিনি তুলে ধরেছেন। তাদের জীবন দ্বীপবাসীদের জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে না; ওই চারটি চরিত্রের বাস্তবজীবন বর্ণনাও তার লক্ষ্য নয়, ওই দ্বীপে জীবন যাপন করতে বাধ্য এ সব চরিত্রের মনোকষ্ট, চিন্তা, বিরহবেদনা, দর্শনচিন্তা ইত্যাদির বিবরণ রচনা করেছেন লেখক। যেখানে তিনি মগ বা পতুর্গীজ জলদস্যুদের উত্তর পুরুষদের আঁকতে চেয়েছেন সেখানে তারা হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ প্রবৃত্তির সমষ্টি, বাস্তব সাধারণ মানুষ নয়। ''উপনিবেশ'' উপন্যাসে পাঁচটি চরিত্রের জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যদিও লেখক বলেছেন দ্বীপবাসীদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি থেকে আসা ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, তবে উপন্যাসে ওই মুসলমানদের জীবনবাস্তবতা তুলে ধরা হয়নি। লেখক ওই দ্বীপে কর্মোপলক্ষে আগত কয়েকজন হিন্দুর জীবন যাপনের বিবরণ লিখেছেন, ফরিদপুর থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী একজন হিন্দু কবিরাজের দ্বীপ-জীবনের বিবরণ দিয়েছেন, একটি মগ-দম্পতির জীবনবৃত্তান্ত এবং পতুর্গীজ উত্তর-পুরুষদের কয়েকজনের জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। মগ-পর্তুগীজদের বাস্তব-জীবনের চেয়ে প্রবৃত্তিগত জীবনের রূপায়ণেই লেখক আগ্রহী ছিলেন বেশী, তারা সাধারণ পেশা গ্রহণে আগ্রহী নয়, জলদস্যুদের ওই উত্তর-পুরুষেরা নিষিদ্ধ জীবন ও পেশার প্রতি আসক্তি বোধ করে। তারা হিংস্র, ক্রূর, শঠ, উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবনে অভ্যস্ত। লেখক তাদের এঁকেছেন চড়া রঙে। যেমন ওই মানুষদের উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম প্রবৃত্তিবশ্য অনৈতিক বলে দূর থেকে কল্পনা করে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি, ওই কল্পনাকেই রূপায়িত করা হয়েছে।

''উপনিবেশ'' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (প্রকাশকাশ নেই) প্রথম খণ্ডের পাত্রপাত্রীদেরই প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের বিবরণ রচনা করা হয়। চর ইসমাইলের বাসিন্দাদের পাশবজীবনের হিংস্রতা ও পশুত্বের পরিচয় দেয়াই এ-খণ্ডে লেখকের লক্ষ্য। ওই সমাজের প্রতিটি মানুষ অন্যায় ও

পাপাচারের তাগিদ রক্তের মধ্যে বোধ করে। পর্তুগীজ আদিবাসীদের উত্তরপুরুষেরা যেমন অবৈধ ব্যবসা করে, তেমনি মূল ভূখণ্ড থেকে পাওয়া ধনী জমিদারও আফিঙের চোরাচালান করে। ওই আদিম সমাজে সদস্যরা একে অন্যকে বিশ্বাস করে, সময় ও সুযোগ বুঝে প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রতারণা করে। শক্তি ও হিংস্রতাই ওই সমাজে টিকে থাকার যোগ্যতা। আইনের শাসন ওই জীবনে অচল, খুন হত্যাকাণ্ড রাহাজানি ওই সমাজে নৈমিত্তিক ব্যাপার। ঘুষ দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ রাখে শক্তিমান অপরাধী এবং প্রকৃত অপরাধী কোনো শাস্তিই পায় না। ওই সভ্যতাবিচ্ছিন্ন জলবেষ্টিত আদিম ভূখণ্ডে সভ্যমানুষ এসেও বন্য উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে প্রতিবেশের প্রভাবে। কামক্ষুধা নৃশংসতা হত্যা করার প্রবণতা—মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তিগুলোই ওই জীবনে প্রধান। এই প্রবৃত্তির গাথাই লেখক রচনা করেছেন। প্রাত্যহিক বাস্তবজীবন থেকে দূরবর্তী দুর্গম দ্বীপজীবন সম্পর্কে আমাদের মনে এক ধরনের রোম্যান্টিক ধারণা আছে। মনে করা হয় ওই জীবন হিংস্র, ভীতিকর, আদিম ও পাশবিকতায় পরিপূর্ণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চর ইসমাইলকে এমনই একটি ভূখণ্ডরূপে প্রতিপাদন করে রোমান্সধর্মিতারই পরিচয় দিয়েছেন।

''হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'' (১৯৪৭) উপন্যাসের রাঢ় ভূখণ্ডের কোপাই তীরবর্তী কাহার সম্প্রদায়ের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটিকে আঞ্চলিকতাবাদী উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সাধারণ ভদ্রলোকের পল্লীগুলো থেকে দূরে নদীর তীরবর্তী নীলকুঠী সংলগ্ন ভূখণ্ডে তাদের বসবাস। নীলকুঠীর সাহেব মেয়ের পালকি বইবার জন্য এবং গৃহকর্মের নানা কাজ করার জন্য অন্য অঞ্চল থেকে তাদের এনে ওই অঞ্চলে বসত করানো হয়। কোপাই তীরবর্তী ক্ষুদ্র একটি অংশে সামান্য ক'ঘর কাহার বাস করতে থাকে। তাদের ভাষাভঙ্গী বসত করানো হয়। কোপাই তীরবর্তী ক্ষুদ্র একটি অংশে সামান্য ক'ঘর কাহার বাস করতে থাকে। তাদের ভাষাভঙ্গী অন্যদের থেকে ভিন্ন। ধর্মবোধ, আচার সংস্কার বিশ্বাস, জীবনাচরণ পদ্ধতি, পোশাক সমস্তই আদিম। আদিম সমাজের মতোই একজন গোত্রপতি আছে , সে পাড়ার নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। আছে গভীর আধিভৌতিক বিশ্বাস ও সংস্কার। কাহার সম্প্রদায়ের বাসস্থান, দেবপীঠ, পল্লী-প্রতিবেশের পরিচয়, ধর্মবোধ, নৈতিক বিশ্বাস, জীবনাচরণ, কর্ম, গৃহস্থালি, সামাজিক বিধিবিধান, উৎসব প্রথা, বাচনভঙ্গীর অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তারাশঙ্কর এ-উপন্যাসে। শুধু পরিবেশ-ভূভাগ, বাহ্যিক জীবনধারা ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বিবরণ মাত্র নয়

''হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'', কাহার সম্প্রদায়ের জীবনের গভীর পরিচয়, তাদের ঐতিহ্য, স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা, সঙ্কট সম্ভাবনা, বিশ্বাস–প্রথা এ–সবই উপস্থাপিত হয়েছে।

রাঢ়ের কোপাই নদী তীরবর্তী বাঁশবাঁদি নামক ছোটগ্রামের প্রেক্ষাপটে কাহিনীটি রচিত। কোপাই নদীর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত হাঁসুলীবাঁক। ওই জায়গায় অত্যন্ত অল্পপরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর রূপ হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো। এই জন্য বাঁকটির নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি। বাঁশবাঁদি ছোটগ্রাম, দুটি পুকুরের চার পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারের বসতি। বাঁশবাঁদি গ্রামকে ঘিরে রেখেছে 'সবুজ কস্তার ডুরি মালার মত'। সন্ধ্যায় বাঁশবন থেকে অন্ধকার গোল হয়ে এগিয়ে আসে কাহার পাড়ার দিকে। হাঁসুলীবাঁকের পশ্চিম দিকের প্রথম বাঁকটি বেলগাছ আর স্যাওড়া ঝোপে ভর্তি; ওটি কাহার সম্প্রদায়ের দেবপীঠ–ব্রহ্মদৈত্যতলা, হাঁসুলীবাঁকের দেশ কড়া ধাতের মাটির দেশ। প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, বালি ধূ ধূ করে, এক পাশে মাত্র এক হাঁটু গভীর জল কোনমতে বয়ে যায়। খালবিল পুকুর শুকিয়ে চৌচির হয়ে ফেটে যায়। মাটি হয়ে যায় পাথরের মতো শক্ত আর আগুনে পোড়া লোহার মতো তপ্ত। আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত কোপাইনদী অধিবাসীদের দুর্ভাবনাগ্রস্ত করে রাখে। পরিপূর্ণ হয়ে উঠে হঠাৎ একদিন ভরানদী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে, ভাসিয়ে নেয় সবকিছু। দু'তিন বৎসর অন্তর অন্তর আসে প্রবল আকস্মিক বান—কাহাররা তাকে বলে 'হড়পাবান'। সেই বন্যার স্রোতে পড়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসে মরা বাঘ, ভালুক। বাঁশবাঁদির বাঁশবেঁড়ে জঙ্গল থেকে খানিক দূরে সাহেব ডাঙায় 'আড্ডাগাড়ত' গড়ে তুলেছে বুনো শুয়োরের পাল। দু'একটা কখনো কাহারদের গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে অকস্মাৎ, কেউ কেউ সামনে পড়ে জখম হয়। কাহাররা বুনো শুয়োর মারার জন্য তৈরি করে ফাঁদ। হাত খানেক লম্বা বাখারির ফালির মাঝখানে আধ হাত লম্বা দড়ি বেঁধে প্রান্তভাগে বাঁধে ধারালো বড়শি। তাতে টোপের মত গেঁথে দেয় কলা এবং প্রচুই মদের ম্যাতা, মদ ও ম্যাতার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শুয়োর এসে টোপ গিলতেই বড়শি জিভে গেথে যায়। বানের জলে ভেসে আসে কুমীর। তখন কাহারেরা দল বেঁধে বের হয়, সর্বাঙ্গে হলুদ মাখে, সঙ্গে নেয় কোদাল, কুড়ুল, লাঠি, সড়কি, আর বড় বড় বাঁশের ডগায় বাধা শক্ত কাছির ফাঁস। নানাভাবে চালায় কুম্ভীর বধের পালা। জল সরে গেলে ভেজা

মাটি থেকে ভাপ উঠতে থাকে, মাছি ও মশায় অঞ্চল ছেয়ে যায়। মানুষ চলে, মাথার ওপর ঝাঁকবন্দী মশা সঙ্গে চলে ভনভন শব্দ তুলে। কামড়ে শরীর 'দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে। গরুর গায়ে মাছি বশে থাকে চাপবন্দী হয়ে।' তার কিছুদিন পরেই শুরু হয় ম্যালেরিয়া জ্বর, কখনো কখনো মহামারী আকারে।

কাহারেরা দুই গোত্রে বিভক্ত : বেহারা কাহার এবং আটপৌরে কাহার। এখন কাহারদের দুগোত্রই সম্পন্ন সদগোপদের জমি চাষ করে। কেউ ভাগ জোতদার, কেউ কৃষাণ। যুদ্ধ, বন্যা, মহামারী ইত্যাদির কারণে ধান, চাল, আলু, গুড়, তরকারির দর চড়লে কিংবা পরিধেয় বস্ত্র দুর্মূল্য হওয়া নিয়ে কাহারদের ভাবনা নেই। ধান চালের দাম বাড়লে তাদের কিছু লাভ বা ক্ষতি নেই। তারা মনিবের ক্ষেতে খেটে খায়। ফসলের তিনভাগের একভাগ পায়, তাও দু-মাস খেতে না খেতেই ফুরিয়ে যায়—বাকি ছ মাস মনিবের কাছে 'দেড়ী'তে ধান নেয়, বেচার মত ধান চাল তাদের থাকে না। তারা শস্য বেঁচেও না কেনেও না। বাড়ির আনাচে কানাচের শাকপাতা পুকুর বিল নদীর শামুক গুগলি মাছ ধরে নিয়ে আসে। কয়লার দাম বাড়লেও সমস্যা নেই। কারণ কাহাররা কয়লা পোড়ায় না। নদীর ধারে ঝোপ ঝাড় থেকে কাঠকুটো কুড়োয় তারা। গরুর গোবর ঘেঁটে ঘুঁটে দেয়। কিছু নিজেরা পোড়ায়, বাকীটা দূরবর্তী ভদ্রগ্রাম চন্দনপুরে বিক্রি করে। তবে কাপড়ের দর চড়লে কিছুটা সমস্যা তাদের হয়। পুরুষের গায়ে বছরে চাষের ছ'মাস কাপড় থাকেই না, গামছা পরেই অর্ধেক দিন কাটে, বাকি ছ'মাস-ছ'হাত মোটা কাপড় পরে কাটে। মেয়েদের বছরে চারখানা কি তিনখানা কাপড় হলেও স্বচ্ছলভাবে চলে যায়। তবে তারা 'একটুকুন' সাজগোজ করতে ভালোবাসে বলে দু' একখানা মিহিফুলপার শাড়ি তাদের চাইই। আর মিহি কাপড়ের পয়সাও ঘরের কর্তাকে জোগাতে হয় না, মেয়েরা নিজেরাই ওই পয়সা রোজগার করে নেয়। রোজ খেটে, ভদ্রজনের কাছ থেকে চেয়ে তারা ওই পয়সা জোগাড় করে।

কুঠিয়াল সাহেবদের সময় থেকেই কাহার নারীরা মনে 'রঙ' ধরলে তারা স্বামীকে ছেড়ে মনের মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। ওই নারীরা কাউকে ভালোবাসলে লোকলজ্জা, গুরুজন ও সমাজের ভয় কিংবা সমাজের ঘৃণার কথা ভেবে ওই ভালোবাসা গোপন রাখে না। তাদের কেউ কেউ রক্ষিতা থাকে, অনেকে কুল ত্যাগ করে পেশাদার পতিতায় পরিণত হয়। এ সব কারণে সমাজে নিন্দা হয়, তবে এ-ব্যাপারকে ওই সমাজ অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করে না। যেমন, স্বামীর কারাবাসকালীন

সময়ে আটপৌড়ে বেহার মাতবর পরমের স্ত্রী-কালোশশী চন্দনপুরের বাবুদের হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ ভূপসিং-এর রক্ষিতা হিসেবে থাকে। পরম ফিরে এসে কালোশশীকে সহজেই ঘরে ফিরিয়ে আনে। উচ্চবর্ণের, ছত্রীগোত্রভুক্ত পৈতে সম্বলিত বাবুদের বরকন্দাজের প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠায় কালোশশীকে ওই সমাজ বেশ সমীহের চোখে দেখতে থাকে। কাহার কন্যা বসন্ত জাঙ্গালের চৌধুরী বাড়ির পুত্রের রক্ষিতা হয়ে সন্তানবতী হয়ে ওঠে। শোভন দেখাবার জন্য একটি পঙ্গু অথর্ব কাহার তরুণের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু সন্তানটি জন্মায় চৌধুরীপুত্রের গড়নে। এ নিয়ে সন্তান ও জন্মদাত্রী কারো মনেই গ্লানি জাগে না। ভালোবাসার মানুষের জন্য শিশুপুত্রকে ফেলে দেশান্তরী হয় করালীর মা। কোনো মমতা কিংবা পিছুটান বোধ করে না ওই কাহার নারী। কাহার পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে কাহার নারীও খেটে খায়। কাহার পাড়ার মেয়েরা জাড়লে সদগোপচাষীদের বাড়িতে ভোরবেলায় গিয়ে গৃহস্থালীর কাজকর্ম শুরু করে, ক্ষেতে মজুরের কাজ করে। কাহার বৃদ্ধারা যারা মজুরনী খাটতে পারে না, তারাও বসে খায় না। তাদের 'পিতৃপুরুষের নিয়ম এই, যেমন গতর তেমনই খাটতে হবে। তারা দুপুরবেলা গোরু-বাছুর-ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায়। কাঁখে ঝুঁড়ি নিয়ে, কাস্তে নিয়ে চলে যায় হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে—কোপাইয়ের অপর পারে গোপের পাড়ায় 'মোষদহরী'র বিলে ঘাস কাটতে।'[৫৪]

কাহারদের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস হচ্ছে সম্পন্ন গৃহস্থদের আশ্রয় করে জীবন কাটিয়ে দেয়া, ক্রীতদাসের মতো মনিবের শাসন প্রহার অবিচার সহ্য করা। চাষাবাদ করে খাদ্য জোগানো আর অনটনের সময়ে মনিবের কাছ থেকে সুদে ধান ঋণ করা ছাড়া অন্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা তাদের 'পিতৃপুরুষের বারণ।' তারা মেনে চলে প্রথা : 'পিতৃপুরুষে বলেছিলেন- আশা করবি লক্ষ্মীমন্তকে, মা লক্ষ্মী মনিবের ঘরে ঢুকবেন, মনিবের উঠানে মায়ের পায়ের ধুলো অবশ্যই পড়বে, তাই কুড়িয়ে মাথায় করে আনবি, তাতেই তোর 'সোগুষ্ঠির প্যাট' ভরবে। এতটুকু মিথ্যে নয় পিতৃ পুরুষের কথা।'[৫৫] নতুন জমিতে প্রথম ফসল উঠলে তারা ফসলের ভোগ দেয় নিজেদের দেবতা বাবা ঠাকুরের থালে; মুগসিদ্ধ বরবটি সিদ্ধ আর একবোতল পাকিমদ। মদ ওই জীবনে আনন্দ উৎসবের প্রধান পানীয়। তারপর ফসলের ভোগ দিয়ে আসে জাঙাল গ্রামের কালারুদ্র দেবতার পুরোহিতকে; পাঠায় মনিবের বাড়িতে। মনিব বাড়িতে দেয়ার পর যদি থাকে তবে পাড়ার সবঘরে এক মুঠো করে পাঠিয়ে দেয়। এই-ই ওই

সমাজের প্রথা; পরকালের পুণ্য সঞ্চয়ের উপায়ও এটি।

কাহারপাড়ার বাতাসে গোবরমাটির গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, ধানে গন্ধ, কাঠ-ঘুঁটে পোড়ার গন্ধ, সারগাদার গন্ধ, পচাই মদের গন্ধ, বাড়ি আশে পাশের বাবুরি তুলসী গাছের গন্ধ মিশে বাতাসকে জমাট ভারী কে রাখে। কাহার পাড়ায় যে রাত্রি নেমে আসে তার সঙ্গে অন্যান্য গৃহস্থগ্রামে রাত্রির অনেক তফাৎ। ওই রাত্র ভীতি ও ত্রাস পরিপূর্ণ, নিশ্ছিদ্র গভীর অন্ধকারময়। চারপাশের বাঁশবনের তলায় জমে থাকা অন্ধকার কাহার পাড়ার রাত্রিকে ঘন ও দুর্ভেদ্য করে তোলে। তাদের মন নানারকম সংস্কার বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভূতপ্রেতেও আছে গভীর বিশ্বাস। সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাককে মনে করে দেবরোষ, ক্রুদ্ধ দেবতার দেয়া শাস্তি। তাদের জীবনে অনিষ্ট সাধনের জন্য ওত পেতে থাকে রাত্রি ভরে অশুভ শক্তিরা। ওই জীবনেও আসে ঋতুতে ঋতুতে নানা ধর্মীয় উৎসব। ছেলে ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে গায় ধর্মরাজের বোলান, মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসে ভাদু ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা দশভুজার পূজায় গায় পাঁচালি। কার্তিক থেকে মাঝ ফাল্গুন পর্যন্ত শীতের সময় গান বাজনার আসর ঝিমিয়ে পড়ে। শীতে ধানকাটা, ফসল তোলা শেষ হলে চৈত্রে নতুন করে বসে ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের পালা। বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক উৎসবে রাত্রিভরে চলে মদ্যপান, গানবাজনা, নাচের হুল্লোড়। কাহার পাড়া ঢোল কাসি সানাই-এর সুরে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তেল হলুদ রঙ নিয়ে শুরু হয় মাতামাতি। থাকে 'প্রচুর মদ, বড় বড় হাঁড়ি থেকে বাটি ভরে তুলে দিচ্ছে একজন, সকলে আকণ্ঠ পান করছে।'[৫৬]

কুসংস্কার , ভীতি, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, দেবরোষের শঙ্কায় সর্বদা তটস্থ কাহারেরা। যা কিছু আকস্মিক ভাবে ঘটে তাকে দৈব, অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী বলে গ্রহণ করে। খুঁতো পাঠা বলিদানের অপরাধ খণ্ডনের জন্য আরেকটি নিখুঁত পাঠা বলিদান করে প্রতিবিধানের জন্য তৎপর হয় তারা। সেই সঙ্গে নতুন জমি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে কর্তাঠাকুরকে আগামতুষ্ট করার জন্য আর একটি পাঁঠা জুড়ে দেয়। বাবাঠাকুরের পূজা হয় মদে মাংসে, ফুলে বেলপাতায় আতপ চিনিতে, তেলে সিঁদুরে, কাপড়ে দক্ষিণায়। কোপাইয়ের তীরে শিস দিয়ে চলা অজগর তুল্য চন্দ্রবোড়া সাপটিকে কাহার তরুণ কাপালী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। কাহারকুল ভয়ে আতঙ্কে হিম হয়ে যায়। এই চন্দ্রবোড়াটিকে বাবার বিচিত্র বর্ণ-বাহন বলে মনে করতে থাকে এবং কর্তার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপে কাহারকুলের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে বলে মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর্থনীতিক চাপে বিপর্যস্ত হয় কাহারদের জীবন। দুর্দশাগ্রস্ত কাহার নারী-পুরুষকে করালী চন্দনপুরের বিভিন্ন কারখানায় কাজ জুটিয়ে দেয়। বর্ষীয়ান মোড়ল বনওয়ারী কাহারদের ওই কাজে যেতে বারণ করে, কারণ 'পিতিপুরুষের বারণ আছে দক্ষিণে যেতে'। ওই বারণ কেউ মানে না। করালী বনওয়ারীর দ্বিতীয় স্ত্রী সুবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুবাসী গরুবাছুর বিক্রী করে অসুস্থ স্বামীকে ফেলে করালীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। করালীর স্ত্রী পাখী আত্মহত্যা করে। কাহারদের মুনিব জাঙ্গালের ঘোষ বাবু যুদ্ধকালে চড়াদাম পাবার সুযোগ পেয়ে কাহারপাড়ার বাঁশঝাড় ও জঙ্গল বিক্রি করে দেয়। উজাড় হয়ে যায় কাহার পাড়ার গহীন বনভূমি, কাহাররা সবাই পরিণত হয় কারখানার শ্রমিকে। বনওয়ারী দীর্ঘদিন রোগে ভুগে মারা যায়। কাহারপাড়ার চারপাশের প্রাচীন বৃক্ষরাজি ও বাঁশবন উজাড় হয়ে গেলে এবং কাহারদের সবাই চন্দনপুরে শ্রমিকের জীবনযাপন করা শুধু করলে কাহারপাড়া পরিত্যক্ত পোড়ো গ্রামে পরিণত হয়। এমন সময় একদিন কোপাই নদীর প্রবল বান ভাসিয়ে নিয়ে যায় কাহারপল্লী। বানের পর কাহারপাড়ার ভূমি বালিময় বিরান প্রান্তরে পরিণত হয়। আর শ্রমিক কাহাররা পরিণত হয় নতুন মানুষে, তারা চন্দনপুরের কারখানায় খেটেও না খেয়ে মরে, রোগে মরে। সাপের কামড়ের বদলে কারখানায় কাটা পড়ে মরে। কিন্তু তার জন্য আর তারা দেবতা 'বাবাঠাকুর'কে ডাকে না। অনেকদিন পর বাঁশবাঁদির বাঁধের বালি ফুঁড়ে বাঁশের ফোড়া মাথা তোলে, কচিঘাসে ছেয়ে যায় বিরান প্রান্তর। করালী গাইতি হাতে ছুটে যায় বালি খুঁড়তে। বালি সরিয়ে মাটি বের করে সে নতুন কাহারপাড়া গড়ার সঙ্কল্প নেয়।

এ-উপন্যাসে তারাশঙ্কর একটি আদিম জনগোষ্ঠীর জীবন সংস্কৃতি বিশ্বাস ধর্মবোধ উপস্থাপন করেছেন অবিকল উপস্থাপনার রীতিতে। তিনি তাদের জীবনপদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এ-উপন্যাসটিকে বিশেষ কোনো ব্যক্তির জীবননির্ভর আখ্যান না বলে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর এক ধরনের নৃতাত্ত্বিক বর্ণনা বলা যেতে পারে। তারাশঙ্করের ''নাগিনীকন্যার কাহিনী''ও এ-ধরনের উপন্যাস, তবে ওই উপন্যাসের জনগোষ্ঠী ও প্রতিবেশ সম্পূর্ণ কল্পিত। এখানে সম্পূর্ণ কল্পিত জীবন ও কল্পিত ভূখণ্ডকে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এটি আঞ্চলিক রঙবাদী উপন্যাস রূপে গণ্য হতে পারে না, একে গণ্য করা যায় কল্পিত এক রহস্যময় ভূখণ্ড ও রহস্যময় নর-নারীর কাহিনী-নির্ভর রোমান্স হিসেবে।

## তথ্যনির্দেশ


১.ক উদ্ধৃত, অশ্রুকুমার সিকদার, 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস: বিষয় ও বিন্যাস', ''আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'', পৃ. ৩৫

১.খ সুকুমার সেন, ''বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'' (৪র্থ খণ্ড), (বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬৫/১৯৫৮), পৃ. ২৯৭

২. উদ্ধৃত, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ, ''বিভূতি-রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৭, চতুর্থ ১৩৮৫), পৃ. ৪৯৩

৩. ওই, পৃ. ৪৯৩

৪. উদ্ধৃত, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ, ''বিভূতি-রচনাবলী'' (দ্বাদশ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স কলকাতা (প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮৭), পৃ. ৩৯০

৫. ''অশনি সংকেত'', পৃ. ১৯৮

৬. ''পথের পাঁচালী'', পৃ. ৩

৭. ''বিপিনের সংসার'', পৃ. ২১৪

৮. ''কেদাররাজা'', পৃ. ১৭১

৯. অনিলবরণ রায়, 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ', ''বিচিত্রা'', ৩:১, ১৩৩৬, পৃ. ৩৭০

১০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'', দে'জ পাবলিশিং, দে'জ সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ২৬৭

১১. মোহিতলাল মজুমদার, 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য', ''সাহিত্যবিতান'', ১৩৬৮, পৃ. ৩১১

১২. সুকুমার সেন, ''বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), (বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৬৫) পৃ. ৩০২–৩০৩

১৩. অশ্রুকুমার সিকদার, 'মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর জগদীশ গুপ্ত', ''আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'', অরুণা প্রকাশনী (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ. ৮৬

১৪. ওই, পৃ. ৭২–৭৩

১৫. ''লঘুগুরু, ''জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী'' প্রথম খণ্ড, ১৩৮৫, পৃ. ৩০

১৬. ''লঘুগুরু'', পৃ. ৫৭

১৭. ''মহিষী'', পৃ. ১৫৬

১৮. ''মহিষী'', পৃ. ২৮০

১৯. ''মহিষী", পৃ. ১৮০।

২০. ওই, পৃ. ২২৯

২১. ''দুলালের দোলা'', পৃ. ২৩৬

২২. ওই, পৃ. ২৩৭

২৩. ওই, পৃ. ২৫৩

২৪. উদ্ধৃত, অশ্রুকুমার সিকদার, ''মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর জগদীশ গুপ্ত, ''আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'', পৃ. ৭৩
২৫. অশ্রুকুমার সিকদার, ওই, পৃ. ৭৪
২৬. ''রোমন্থন'', পৃ. ১০৩
২৭. ওই, পৃ. ১০৫
২৮. ''তাতলসৈকতে'' পৃ. ২২৬
২৯. ওই, পৃ. ২৮৪
৩০. ওই, পৃ. ২৭৬
৩১. ওই, পৃ. ২৮৩
৩২. ওই, পৃ. ৩১১
৩৩. অশ্রুকুমার সিকদার, পৃ. ৭৭
৩৪. ''নীলকণ্ঠ'', তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১
৩৫. '' প্রেম ও প্রয়োজন', তারাশঙ্কর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৭
৩৬. ওই, পৃ. ৩৬৮
৩৭. প্রথমনাথ বিশী, 'ভূমিকা', তারাশঙ্কর রচনাবলী প্রথম খণ্ড
৩৮. ওই, পৃ. ১৯০
৩৯. ''গণদেবতা'', তারাশঙ্কর রচনাবলী ৩য় খণ্ড, পৃ ২৪০
৪০. ''গণদেবতা'', ওই, পৃ. ১৪৬
৪১. ''গণদেবতা,'' ওই, পৃ. ১০৬
৪২. উদ্ধৃত, 'গ্রন্থপরিচয়', তারাশঙ্কর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩৫
৪৩. ''পঞ্চগ্রাম'', তারাশঙ্কর রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৮
৪৪. উদ্ধৃত, তারাশঙ্কর রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, পৃ . ২
৪৫. ভূমিকা, ''পদচিহ্ন'' (১৩৫৭)
৪৬. ''পদচিহ্ন'', তারাশঙ্কর রচনাবলী নবম খণ্ড পৃ. ২৪০
৪৭. ''পদচিহ্ন'', ওই, পৃ. ২৫৩
৪৮. ''চিন্তামণি'', মানিক গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৪৯–৫০
৪৯. ''চিন্তামণি'', পৃ. ৪১–৪২
৫০. ভূমিকা অংশ, ''সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'' (১৩৫২)
৫১. 'আত্মকথা', নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড , পৃ. ৬০৯
৫২. 'গ্রন্থপরিচয়', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, প্রথম খণ্ড পৃ. ৬৩১
৫৩. ওই, পৃ. ৬৩৯
৫৪. ''হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'', তারাশঙ্কর রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড পৃ. ২০৫
৫৫. ওই, পৃ. ২৪৩
৫৬. ওই, পৃ. ২৫৯